তিন গোয়েন্দা

জলদস্যুর দ্বীপ ১

রকিব হাসান

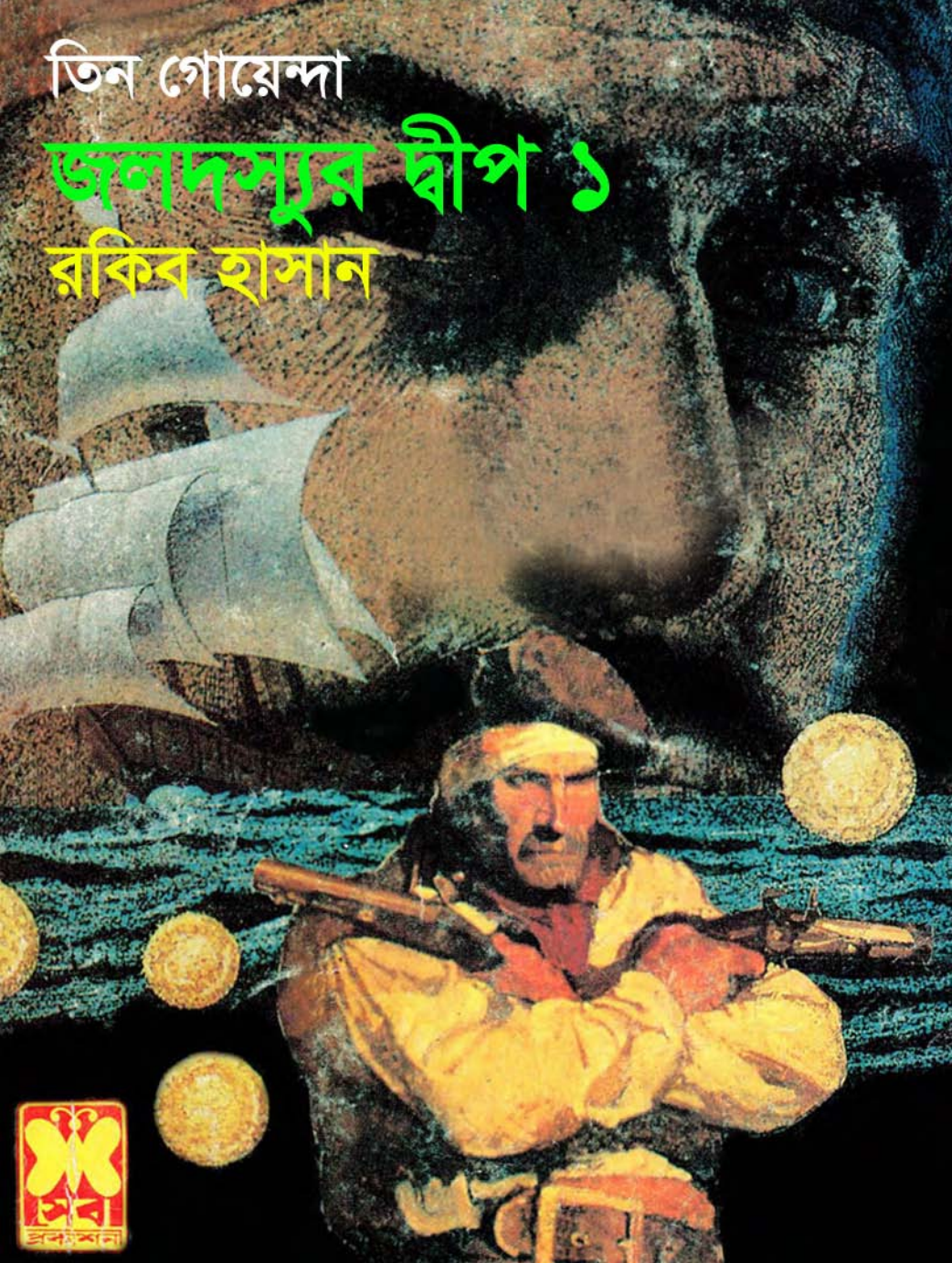

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1282-8

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-2
Part-2
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hasan

ছত্রিশ টাকা

জলদস্যুর দ্বীপ ১

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৭

মৃদু ঢেউয়ে দুলছে দুটো জাহাজ—একটা ব্রিটিশ, নাম সাউথ আটলান্টিক, অন্যটা স্প্যানিশ, নাম সান্তা মারিয়া, গায়ে গা ঘষা লেগে আওয়াজ উঠছে ক্যাঁচকোঁচ, শোনা যাচ্ছে শেকলের ঝনাৎঝন। মোটা দড়ি দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বেঁধে রাখা হয়েছে, কখনও টানটান হয়ে যাচ্ছে দড়ি, ছেঁড়ে ছেঁড়ে অবস্থা, তার পরেই আবার একেবারে ঢিল হয়ে যাচ্ছে।

মাথার ওপর মস্ত খোলা আকাশ গাঢ় নীল, শুধু অনেক পশ্চিমে হিসপ্যানিওলা পর্বতের ধোঁয়াটে চূড়ার মাথায় তুলোর মত খানিকটা শাদা মেঘ, ধীরে ধীরে ভেসে আসছে এদিকে। জাহাজদুটোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে একটা অ্যালবেট্রস, তুষারশুভ্র ছড়ানো বিশাল ডানা স্থির, সামান্যতম কাঁপনও নেই পালকগুলোতে, কি এক অদ্ভুত কৌশলে বাতাসে ভেসে রয়েছে পাখিটা, নিচে কাচের মত পরিষ্কার পানিতে তার ছায়া ভেঙে যাচ্ছে ডলফিনের দাপাদাপিতে। কাছাকাছিই রয়েছে ঝাঁকটা, কখনও জাহাজের একেবারে কাছে চলে আসছে, পরক্ষণেই একে অন্যকে তাড়া করে সরে যাচ্ছে আবার দূরে।

জ্যান্ত এই ছবির সঙ্গে মানিয়ে গেছে চমৎকার স্প্যানিশ জাহাজটা—রাজকীয় একটা কাঠের গ্যালিয়ন, লাল আর রূপালী রঙ করা কাউন্টার, পেছনের উঁচু পুপ সোনালি, কিছু পাল মাখনরঙা, কিছু টকটকে লাল।

অন্য জাহাজটা ঠিক তেমনি বেমানান, বড় একটা ক্যানভাস, যেটা দিয়ে কামান ঢেকে রাখা হত, সেটা এখন দলেমুচড়ে পড়ে রয়েছে ভাঙা প্রধান মাস্তুলের গোড়ায়, তাতে অসংখ্য গুলির ফুটো। জাহাজের উজ্জ্বল রঙ জায়গায় জায়গায় মলিন করে দিয়েছে শুকনো রক্তের কালচে দাগ। ডেকে জমাট রক্তের মাঝে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে নাবিকদের লাশ, কেউ শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, কেউ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ডেকে, কেউবা আবার চেয়ে আছে যেন গ্যালিয়নের পতাকাদণ্ডে উড়তে থাকা ভয়ঙ্কর পতাকাটার দিকে, তাতে আঁকা মানুষের হাড়ের একটা ক্রস, ক্রসের ওপর মড়ার খুলি—জলদস্যুর প্রতীকচিহ্ন। অতি সাধারণ একটা দৃশ্য ছিল এটা শতশত বছর আগে, ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমলে।

সাউথ আটলান্টিক আড়াইশো টনী জাহাজ, স্প্যানিশ মেঈন থেকে বাড়ি ফিরছিল, ইংল্যাণ্ডে, পথে দেখা হয়ে যায় সান্তা মারিয়ার সঙ্গে। সান্তা মারিয়া তখন ওই অঞ্চলের সাগরের ত্রাস লুই ডেকেইনির দখলে। লোকে বলে, লুই ডেকেইনি মানুষ না, মানুষরূপী খোদ ইবলিস, গায়ে ফরাসী ওলন্দাজের মিশ্র রক্ত, নাবিকেরা তার নাম শুনলেই আঁতকে উঠত তখন। কাউকে রেহাই দিত না। ডেকেইনি

এমনকি শিশু আর বৃদ্ধরাও নিস্তার পেত না তার হাত থেকে, নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়ে যেত। সেই ডাকাতের কবলে পড়ল ব্রিটিশ জাহাজটা।

সেদিন ভোরে দিগন্তে দেখা দিল সান্তা মারিয়া, দূর থেকে দেখেই, চিনল সাউথ আটলান্টিকের ক্যাপ্টেন রিচার্ড হ্যারিসন। চমকে উঠল। মহাদানব দেখা দিয়েছে, নিস্তার পাওয়া মুশকিল! তাদের ভাগ্য খারাপ, হঠাৎ করেই বাতাস পড়ে গেল এই সময়, গতি কমে গেল জাহাজের। সান্তা মারিয়া জাহাজ বড়, তার পালও বড়, পালে হাওয়া বেশি লাগে, ফলে ব্রিটিশ জাহাজের চেয়ে গতি বেশি এখন তার।

দ্রুত এগিয়ে আসছে জলদস্যুর জাহাজ। বুঝে গেল ক্যাপ্টেন হ্যারিসন, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইল, নাবিকদের ডেকে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল, তাদেরকে বলল, মরতেই যখন হবে, বিনা লড়াইয়ে মরবে না, বীরের মত লড়ে যাবে শেষ অবধি, যে ক'টা ডাকাতকে শেষ করে দেয়া যায়, তা-ই লাভ।

বীরের মতই লড়ল হ্যারিসন আর তার দল। কিন্তু টিকল না বেশিক্ষণ। পিলপিল করে জাহাজে উঠে এল ডাকাতের দল, ঘিরে ফেলল। তারপর শুরু হলো পাইকারী গণহত্যা। ক্যাপ্টেনের হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে ঈশ্বরের নাম। একে একে মারা গেল ব্রিটিশ জাহাজের সব নাবিক, পেছন থেকে মাথায় আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে ডেকে পড়ে গেল হ্যারিসন···

মরল না ক্যাপ্টেন। তার সঙ্গীসাথীরা কেউ জীবিত নেই। ক্যাপ্টেনের ঠ্যাঙ ধরে হিড়হিড় করে সারা ডেকে টেনে হিঁচড়ে কষ্ট দিতে লাগল কয়েক ডাকাত মিলে, অন্যেরা লুটপাট চালাল জাহাজে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আনা হলো ডেকেইনির সামনে। স্প্যানিশ মেইন থেকে সহসা আর কোন জাহাজ ছাড়বে কিনা, ছাড়লে কোনদিকে যাবে, জানতে চাইল ডেকেইন। কিন্তু মুখে খিল এঁটে রইল ক্যাপ্টেন, কোন জবাবই দিল না। চাবুক দিয়ে তাকে যেভাবে খুশি পেটাল ডাকাতেরা, ক্যাপ্টেন অটল, টুঁ শব্দ করল না। শেষে ডাকাতরাই বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে, জাহাজের গা থেকে বের করে রাখা চওড়া একটা তক্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো তাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের চেহারায় মৃত্যুভয় নেই, 'মেরে ফেলো বা যাই করো, থোড়াই কেয়ার করি!' এমনি ভাব ফুটে রয়েছে।

তার চেহারার এই ড্যাম কেয়ার ভাব দেখে চমকে গেছে ডাকাতেরা, থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। শুধু মাছখেকো পাখির চিৎকার আর ঢেউয়ের মৃদু বিড়বিড় ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

খুনী লুই ডেকেইনি, যার অনেকগুলো ভয়ংকর নাম, সে-ও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে। তার নাম শুনলেই লোকে আতকে ওঠে, চেহারা দেখে ভিরমি খায়, স্প্যানিশ মেইনের আতঙ্ক সেই দানব লুইয়ের সামনেও এতখানি অটল থাকছে কি করে লোকটা, এত আত্মবিশ্বাস কিসের! জানে মরবে, তবুও এত শান্ত রয়েছে কি করে ওই ইংরেজ ক্যাপ্টেন? কেমন যেন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে ডেকেইনির মনে। ব্যাপারটা কি?

কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে অনেক নিচের সাগরের দিকে চাইল একবার ক্যাপ্টেন, তারপর তাকাল আবার ডাকাতদের মুখের দিকে। তাদের চোখে ঘৃণা নেই, ভয় নেই, রয়েছে কেমন একটা দ্বিধা, জয়ের আনন্দ ফুটতে পারছে না ঠিকমত। ওদের দৃষ্টি স্থির ক্যাপ্টেনের কপালের দিকে। বন্দির ভুরুর ওপরে একটা রক্তাক্ত কাটা জখমের ওপরে উপরের আরেকটা জখম থেকে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামছে, ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে একটা ক্রুশ।

অশুভ সঙ্কেত! গুঞ্জন উঠল ডাকাতদের মাঝে, অদ্ভুত গুঞ্জন, বহুদূরের পাথুরে সৈকতে সাগরের ঢেউ ভাঙল যেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল শব্দ, কথা বলে উঠেছে ক্যাপ্টেন।

'নরকের কুত্তার দল!' চেঁচিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, 'তোদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আরেক পূর্ণিমা দেখার সুযোগ পাবি না কেউ!'

রোদতপ্ত বাতাস চিরে দিল যেন ডাকাতদের মিলিত চিৎকার।

'গুলি করো!' ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কয়লার মত কালো এক নিগ্রো।

'পেররো! ভামো আ ভার!' চাপা গলায় গর্জে উঠল আরেক স্প্যানিয়ার্ড।

'গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে উল্টো করে লটকে দাও!' গোঁ গোঁ করল একচোখো এক দানব।

'উডল···উডল চালাও, শিক্ষা হয়ে যাবে ব্যাটার!' পরামর্শ দিল আরেকজন।

'চুপ!' দস্যু-সর্দারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন চাবুক মেরে নীরব করে দিল সবাইকে। সে তাকিয়ে রয়েছে ইংরেজ ক্যাপ্টেনের শান্ত হাসিহাসি মুখের দিকে। আশ্চর্য! মৃত্যুকে সামনে দেখেও ভয় পাচ্ছে না কেন লোকটা!

'আমার জাহাজ থেকে যেসব মোহর নিয়ে তোমার মোহরের সঙ্গে মিশিয়েছ,' ডেকেইনিকে বলল ক্যাপ্টেন, 'তার মধ্যে বিশেষ একটা ডাবলুন রয়েছে, মন্ত্রপূত অভিশপ্ত মোহর। তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল ডেকেইনি, মরেছ তোমরা। জোসেপ বউন-এর নাম নিশ্চয় শুনেছ, লালচুলো সেই বিখ্যাত দস্যু, ছায়ার মত যার গতিবিধি ছিল, গত হপ্তায় পোর্ট রয়ালে ধরে আনা হয়েছিলো তাকে। ওই মোহরটা ছিল তার পকেটে। মৃত্যুর আগে কি করেছে সে জানো? ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়ে মোহরটাতে তিনবার থুথু ছিটিয়ে অভিশাপ দিয়েছে সে—যার হাতেই যাবে ওই মোহর, ধ্বংস হয়ে যাবে সে, খুব দ্রুত।'

কেঁপে উঠল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নাবিকেরা, আবার উঠল ভয়ার্ত গুঞ্জন।

'সেই মোহরটা এই জাহাজেই আছে, ইংল্যাণ্ডে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলে গেল ক্যাপ্টেন, 'আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। সাত দিনের বেশি টিকলাম না, তারমানে বউনের অভিশাপ কাজ করেছে। তোমাদেরও সময় ঘনিয়ে আসছে, রেহাই পাবে না কিছুতেই। তোমার ধনের সঙ্গে মোহর এখন মিশে গেছে। বাঁচতে হলে এখন সব মোহর ঢেলে ফেলে দিতে হবে সাগরে, সেটা করার কলজে তোমার হবে না। কাজেই মরেছ!'

জবান বন্ধ হয়ে গেছে ডাকাতদের। থমথমে হয়ে গেছে চেহারা, মনে মনে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে কেউ কেউ, সবার মুখেই স্পষ্ট ভয়।

নীল আকাশের দিকে নীল চোখ তুলল ক্যাপ্টেন হ্যারিসন। 'ঈশ্বর, আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ। বউনের অভিশাপের সঙ্গে মিলিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি আমি, মোহরের ধ্বংস-ক্ষমতা জোরালো করো, আরও আরও অনেক বেশি জোরালো, যতক্ষণ না...'

গর্জে উঠল ডেকেইনির পিস্তল, আগুনের একটা হলকা ছুটে এসে ঢুকে গেল ক্যাপ্টেনের বুকে।

কথা থেমে গেছে হ্যারিসনের, আকাশের দিকেই চেয়ে রয়েছে নীল চোখের তারা, ঠোঁট নড়ল সামান্য, তারপর স্থির হয়ে গেল। উল্টে ডিগবাজি খেয়ে দেহটা ঝপাং করে পড়ল পানিতে।

ছুটে এসে দাঁড়াল ডাকাতেরা রেলিঙের ধারে। লাশটা দেখা যাচ্ছে না, ডুবে গেছে, পানিতে অদ্ভুত একটা গোল ঢেউয়ের চক্র ক্রমেই ছড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক মাঝখান থেকে ফুট ফুট করে উঠছে লালচে বুদবুদ। মাস্তুল আর পালের দড়িতে বাড়ি খেয়ে গোঙানি তুলল এক ঝলক বাতাস।

'কি...কি হলো!' আঁতকে উঠল ডেকেইনি, মুখ রক্তশূন্য।

'বোধহয় অ্যালবেট্রস...' মুখ তুলে চেয়েই থেমে গেল কোয়ার্টার মাস্টার ব্ল্যাক জিউস। 'কই! নেই তো। কখন চলে গেছে! ...আরে, দেখো, দেখো!'

দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল ডাকাতেরা। পশ্চিম দিগন্তে, উত্তর-দক্ষিণ ছেয়ে দিয়েছে যেন গাঢ় বেগুনী একটা চওড়া মেঘলা, আকাশের নীল ঢেকে দিয়েছে, খুব নিচু দিয়ে ধেয়ে আসছে যেন ওদেরকেই গ্রাস করার জন্যে।

'জলদি!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল ডেকেইনি, 'জলদি জাহাজে গিয়ে উঠো! সব্বাই!' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল তার কণ্ঠ থেকে, ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ।

•

হারিকেনের প্রথম ঝাপটায়ই ব্রিটিশ জাহাজের সঙ্গে বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল ডেকেইনির জাহাজের। প্রচণ্ড ঝটকা দিয়ে ফুলে উঠল সামনের পাল, দড়ির টানে যেন উড়ে গিয়ে সাগরে পড়ল দু'জন ডাকাত, চোখের পলকে হারিয়ে গেল ফেনায়িত ঢেউয়ের তলায়। কাকতালীয় ঘটনাই বোধহয়, এই দুজন বেশি কষ্ট দিয়েছিল ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে। ব্যাপারটা অন্য নাবিকদের চোখ এড়াল না। ওরা ধরে নিল, এতে ঈশ্বরের হাত রয়েছে। আবার ঝাপটা দিল ঝড়ো বাতাস, এত জোরে বাতাস বইতে আগে কখনও দেখেনি ডাকাতেরা। সান্তা মারিয়ার নাক ঘুরে গেল সাঁই করে, হালকা একটা শোলা যেন এতবড় জাহাজটা! পাহাড় সমান ঢেউ ফুঁসে উঠল, আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর, প্রধান মাস্তুলের প্রায় অর্ধেকটাই ডুবে গেল সে ঢেউয়ে, অনেক কষ্টে যেন নাকানি-চোবানি খাওয়া ইঁদুরের মত ভেসে উঠল আবার জাহাজ।

সাত দিন সাত রাত ধরে বইল ভয়াবহ ঝড়, নয়জন ডাকাত মরল, বাকি যারা রইল জাহাজের পানি সেচা তো দূরের কথা, তাদের দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই আর। টলতে টলতে ক্যাপ্টেনের কাছে এসে বলল কোয়ার্টার মাস্টারঃ সমস্ত মোহর ফেলে দিন, নইলে বাঁচব না একজনও।

রাজি হলো না ডেকেইনি।

চেঁচিয়ে শাসাতে শুরু করল ব্ল্যাক জিউস, পেছনে অন্যেরা এসে দাঁড়াল, তারাও কণ্ঠ মেলাল কোয়ার্টার মাস্টারের সঙ্গে। জিউসকে গুলি করে মারলেন ডেকেইনি।

আট দিনের দিন বাতাস পড়ে গেল, কাচের মত স্থির শান্ত পানিতে চুপচাপ ভেসে রইল জাহাজ। অবস্থা কাহিল। খাবার আর পানির সমস্যা দেখা দিল। পানিতে নোনা পানি মিশে গেছে, মাংস আর রুটি পচে ফুলে উঠেছে, পোকা কিলবিল করছে তাতে, খাওয়ার অযোগ্য। বিড় বিড় করে কার উদ্দেশ্যে গাল দিল ডাকাতেরা, কে জানে।

সন্ধে নাগাদ দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। একদল চায়, সমস্ত মোহর পানিতে ফেলে দেয়া হোক, তাতে জীবন বাঁচলেও বাঁচতে পারে; আরেক দল অত ভয় পেল না, তারা ডেকেইনিকে সমর্থন করল। তর্ক-বিতর্ক থেকে মারাত্মক লড়াই, তারপর খুনজখম, খতম করে দেয়া হলো বিদ্রোহীদের। জলদস্যুর নিয়ম অনুযায়ী সাগরে ফেলা হলো লাশগুলো। স্থির সাগর আর স্থির রইল না, জাহাজের আশপাশে কিলবিল করতে লাগল শ'য়ে শ'য়ে হাঙর।

পরের ছয় দিনে আরও অনেক দল পাল্টাল, বিদ্রোহী হয়ে উঠল, আগের সঙ্গীদের পরিণতি হলো এদেরও। যারা মরল, তারা বরং বেঁচে গেল। যারা বেঁচে রইল, তাদের খাবার নেই, পানি নেই, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে ফাটে। অগত্যা রামের বোতল খুলে গলায় ঢালল কড়া মদ, কণ্ঠনালী জ্বালিয়ে দিল যেন তরল আগুন, ডেকে গড়াগড়ি খেতে লাগল সবাই। নেশার ঘোরে অন্তত খিদের কষ্ট আর তৃষ্ণা ভুলে রইল। দুর্বল কণ্ঠে বিখ্যাত জলদস্যু মরগানের গান ধরলঃ

'ইফ দেয়ার বি ফিউ অ্যামাংস্ট আস
আওয়ার হার্টস আর ভেরি গ্রেট;
অ্যাণ্ড ইচ উইল হ্যাভ মোর প্লাণ্ডার,
অ্যাণ্ড ইচ উইল হ্যাভ মোর প্লেট।'

কিন্তু পরের দিনই আর 'হার্ট' ততবড় থাকল না. নেশা ছুটে গেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা পাগল করে তুলল যেন ওদের। শিস দিয়ে সঙ্গীদের চাঙা করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল লুই ডেকেইনি। কাচের মতই সমতল রয়েছে এখনও সাগর। শিস দিয়েই বাতাসকেও আমন্ত্রণ জানাল ডেকেইনি, কিন্তু বাতাসও সাড়া দিল না তার ডাকে।

সাগরকে রক্তাক্ত করে দিয়ে যেন মস্ত একটা রক্তলাল সূর্য অস্ত গেল সেদিন, মাথায় লাল একটা বড় রুমাল বেঁধে একজন সহকারীকে ডাকল সর্দার। সারাদিন রাম গিলেছে, গলা শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত খসখসে হয়ে আছে, জানাল সঙ্গীদেরকে। আরও এক বোতল এনে দেয়ার অনুরোধ করল। বোতল এনে দিল লোকটা। কিন্তু মুখে তুলল না সর্দার, রেলিঙে হাত রেখে শান্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে। হাতটার দিকে ভালভাবে নজর পড়তেই চমকে উঠল লোকটা, চোখ বড় বড় হয়ে গেল, সর্দারের হাতের উল্টো পিঠে শাদা ধুলো লেগে রয়েছে যেন, একটা গোল দাগ!

ডেকেইনির এই সহকারী পোড়খাওয়া নাবিক, অনেক দেখেছে অনেক শুনেছে, জাতে ফরাসী। ছুটে গেল সে সহকারীদের কাছে। মুখ ছাই, চোখ ঠিকরে বেরোবে যেন, বলল, 'ওকে···প্লেগে ধরেছে!' এটুকু বলেই চুপ হয়ে গেল।

ভয়েল, এক-হাত-ওয়ালা এক কামানবাজ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, গাল দিয়ে উঠল অস্ফুট স্বরে, অনেক সাগর ঘুরেছে সে, অভিজ্ঞতা আছে অনেক, জানে এখন কি করা দরকার! টান মেরে খাপ থেকে ছুরি বের করল, কিন্তু খপ করে তার হাত চেপে ধরল ফরাসী ডাকাত, কাঁধের ওপর দিয়ে একবার চট করে তাকিয়ে দেখল ডেকেইনি দেখছে কিনা।

সে-রাতে, নেশায় বিভোর হয়ে আছে ডেকেইনি, এই সময় চুপি চুপি নৌকা নামাল তার অবশিষ্ট নাবিকরা—এই একটি মাত্র নৌকাই ঝড়ের কবল থেকে রেহাই পেয়েছে, জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল সাগরে ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে পালাল ওরা, জানে না, কড়া রোদ নৌকার কাঠের সর্বনাশ করে দিয়েছে, প্রতিটি জোড়া প্রায় আলগা। তবে সেটা জানল শিগগিরই। পুরো তিনটি দিন অমানুষিক পরিশ্রম করল ওরা, পালা করে কেউ দাঁড় বাইল, কেউ পানি সিঁচল, তারপর তাদেরকে তুলে নিল একটা স্প্যানিশ জাহাজ। কয়েকটা প্রশ্ন করেই জেনে নিল ক্যাপ্টেন, ওরা কারা। আর একটি কথা না বলে দস্যুদেরকে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিল ফাঁসিতে।

জেগে উঠে দেখল ডেকেইনি, সবাই চলে গেছে তাকে ফেলে, একটা রামের বোতলও রেখে যায়নি। সারাটা দিন অদ্ভুত এক তন্দ্রার ঘোরে কেটে গেল তার, রাতে আবার ঝড় এল, তুমুল ঝড়। খানিকক্ষণ একাই জাহাজটাকে সামলানোর চেষ্টা করল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে হলো শিগগিরই। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, হাঁপাতে হাঁপাতে কেবিনে এসে ঢুকল সে।

ঘুম ভাঙলে খেয়াল করল ডেকেইনি, ঢেউয়ের দোলা থেমে গেছে, জাহাজ প্রায় স্থির। অবাকই লাগল তার। ডেকে বেরিয়ে হাঁ হয়ে গেল। একটা দ্বীপের ধারে চলে এসেছে জাহাজ, অনেক বড় দ্বীপ, এমাথা-ওমাথা দেখা যায় না। একটা প্রাকৃতিক বন্দরে ঢুকেছে জাহাজ, চারদিকে পাহাড়, কি করে ঢুকল এখানে? ভাল করে দেখল···না না, চারদিকে পাহাড় নয়, একদিকে খোলা আছে, পথটা এত সরু, কোনমতে ঢুকতে পেরেছে জাহাজ।

তিনদিক থেকে ঘিরে রাখা ধূসর পাথুরে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল, জাহাজটা যতখানি উঁচু ঠিক ততখানি, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় দেয়াল, ইচ্ছে করলে জাহাজ থেকে লাফিয়ে নামা যায় ওখানে, অবশেষে নামলও ডেকেইনি। সরু একটা গিরিপথমত রয়েছে সাগরেরে দিকে···সাগর দেখতে পাচ্ছে না, তবে ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে, ওই পথেই ঝড়ের সময় ঢুকেছে জাহাজ, এসে পড়েছে পাহাড়ঘেরা ছোট্ট খাঁড়িতে। জায়গা ভালই, কিন্তু প্রথমে দেখা দরকার; ঘন জঙ্গলে মানুষখেকো আদিবাসীরা লুকিয়ে আছে কিনা। পানির ধার ঘেঁষে থাকা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ডেকেইনি, দেখে শুনে নিশ্চিত হলো, আর কোন মানুষ নেই। পাহাড়ের বেশ ওপরে একটা পাথরে আরাম করে বসে চারপাশটা দেখল সে, খুশি হলো, চমৎকার জায়গা। মরগানের গানটা মনে পড়তে হাসল মনে মনে। এখন সে ছাড়া আর কেউ

নেই মোহরের ভাগ নেয়ার, যা আছে সব তার একার। আর হ্যাঁ, জাহাজটা খাঁড়িতে ঢুকতে যখন পেরেছে, এখান থেকে বেরোতেও পারবে। সে একাই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে জাহাজ, তবে তার আগে শরীরের শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। নিশ্চয় খাবার আর পানি আছে দ্বীপে। প্রচুর খাবার নিয়ে তুলতে পারবে জাহাজে, পিপেগুলোতে পানি, তারপর কোন এক সুদিন দেখে পাল তুলে দিয়ে খোলা সাগরে ভেসে পড়লেই হলো। দেখিয়ে ছাড়বে সে তার সঙ্গীদেরকে, যদি কেউ বেঁচে থাকে তখনও, সে একাই একশো, তাদের মত কাপুরুষ নয়।

কোন জায়গায় রয়েছে, ম্যাপ দেখে অনুমান করল ডেকেইনি। খাবার আর পানি পাওয়া গেছে, পেট ঠাণ্ডা, ফলে মাথাও ঠাণ্ডা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল তার। আশ্চর্য! এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন? সেই অভিশপ্ত মোহর! ওটা রয়েছে মোহরের স্তূপে! ব্যাপারটাকে কুসংস্কার বলে আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না এখন। ওরকম সাংঘাতিক একটা জিনিস নিয়ে আবার সাগরে ভাসতে সাহস হলো না তার। উপায়? সহজ একটা উপায় আছে। সব মোহরগুলো দ্বীপেরই কোথাও লুকিয়ে রেখে যাবে। তারপর ভাল মজবুত আরেকটা জাহাজ আর দুঃসাহসী একদল নাবিক নিয়ে আবার ফিরে আসবে, এবার এমন লোক আনবে, যারা আগের নাবিকদের মত কাপুরুষ নয়।

গর্ত খুঁড়ে তাতে মোহর লুকিয়ে রাখত তখন লোকে, কিন্তু ডেকেইনি অত খাটুনির দরকার মনে করল না। পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত খুঁজে বের করল, গোটা তিনেক পিপে একটার ওপর আরেকটা রাখা যাবে গর্তে। মোহরের স্পর্শ উত্তেজনা জাগায় তার, কিন্তু এখন লাগছে ভয়, অস্বস্তি, প্রায় প্রতি খাবলা মোহর থেকেই একটি মোহর তুলে নিয়ে সাবধানে দেখছে, মনে হচ্ছে এটাই বুঝি সেই অভিশপ্ত মোহর! ক্যানভাসের ওপর মোহর রেখে; চারটে কোনা এক করে বেঁধে পোঁটলা বানাল সে। একটা খালি পিপে রেখে এল গর্তে, তারপর পোঁটলা কাঁধে করে নিয়ে চলল। পোঁটলার সমস্ত মোহর পিপেয় ঢেলে আরও নিতে এল। নিয়ে গেল আরেক পোঁটলা। জাহাজে মোহরের স্তূপ যতই ছোট হয়ে আসছে, মন ভারমুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার, হারামী মোহরটা বোধহয় চলে গেল জাহাজ থেকে, আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আগুন ঢালছে যেন সূর্য। কাজ করতে করতে ঘেমে নেয়ে গেল ডেকেইনি। কিন্তু অবশেষে শেষ হলো মোহর স্থানান্তর। কাজ শেষ করে, পাহাড়ে উঠে আরেকবার ভালমত দেখল চারপাশটা, দিক চিহ্ন গেঁথে নিচ্ছে মনে। ফিরে এলে সহজেই যাতে গর্তটা খুঁজে পায়।

জাহাজে এসে কেবিনে ঢুকে কাগজ-কলম বের করল। নিখুঁত একটা ম্যাপ এঁকে নেবে, শুধু চোখের আন্দাজের ওপর ভরসা রাখতে চায় না। প্রায়ই ঝড় বয় এদিকে, সে যখন ফিরে আসবে, দ্বীপের এখনকার চেহারা তখন না-ও থাকতে পারে, তাই যেসব জিনিস সহজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, ওগুলোকেই প্রধান চিহ্ন ধরে এঁকে ফেলল ম্যাপ।

হঠাৎই খেয়াল করল যেন সে বড় বেশি নীরব অঞ্চলটা! উত্তাপ নেমে যাচ্ছে

দ্রুত, বাইরে প্রখর রোদ অথচ শীত লাগছে তার, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আবার অস্বস্তি ফিরে এল মনে। হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ল। জোর করে মন থেকে ভয় তাড়াল সে, খুনী লুই আর যাই হোক, কাপুরুষ, একথা যেন কেউ কখনও বলতে না পারে।

ডেকে বেরিয়ে দেখল, চারদিক নির্জন, সেই আগের মতই। যতদূর চোখ যায়, সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে না, পাথরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মৃদু গুমরানি ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। আপন মনেই মাথা ঝাঁকিয়ে আবার কেবিনে ঢুকতে যাবে, চমকে উঠল একটা তীক্ষ্ণ শব্দে।

ঠিক জাহাজের ওপরেই ভেসে রয়েছে মস্ত একটা অ্যালবেট্রস! অতি পরিচিত মনে হলো পাখিটাকে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ডেকেইনির। সত্যি দেখছে তো, নাকি কল্পনা? ওই পাখিটাকেই দেখেছিল না 'সাউথ আটলান্টিক' দখল করার সময়? আরে দূর, যত্তসব কুসংস্কার!—মনকে বোঝাল সে। কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে তুলল পাখিটাকে গুলি করার জন্যে।

ডেকেইনির মনের কথা পরিষ্কার পড়তে পারছে যেন পাখিটা, ছায়ার মত নিঃশব্দে দ্রুত ভেসে সরে গেল সীমার বাইরে।

পাখিটার আসার অপেক্ষায় রইল ডেকেইনি।

সীমার বাইরে খানিকক্ষণ ভেসে বেড়াল অ্যালবেট্রস, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল আবার। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠছে, মাথা নাড়ছে জ্ঞানী মানুষের ভঙ্গিতে।

জোরে থুথু ফেলল ডেকেইনি, ভয় তাড়াচ্ছে আসলে মন থেকে। জীবনে এই প্রথমবার সত্যি ভয় পেয়েছে সে। দুই লাফে কেবিনে এসে ঢুকল আবার, মোটা একটা মোমের গায়ে পিস্তলটা কক-করা অবস্থায়ই ঠেস দিয়ে রেখে পালকের কলম তুলে নিল, দু'তিন টানে এঁকে শেষ করল ম্যাপটা। কালি ঝাড়তে গিয়েই ঘটল ঘটনাটা। তার জামার আস্তিনের একটা খাঁজ থেকে টুনন্ করে টেবিলে পড়ল একটা জিনিস। ধড়াস্ করে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল ডেকেইনির হৃৎপিণ্ড, দম বন্ধ করে ফেলেছে, ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ। একটা সোনার মোহর!

কয়েক মুহূর্ত মোহরটার দিকে চেয়ে রইল ডেকেইনি, বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্ফুট একটা শব্দ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, মোহরটার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে যেন তাকে জিনিসটা। সে জানে, এটা কি! কোনভাবে এই সাংঘাতিক জিনিসটা তার আস্তিনের খাঁজে আটকে গিয়েছিল, যেন ইচ্ছে করেই, মোহরটা যেন জীবন্ত, জানে-বোঝে সব কিছুই। অনুমান করল ডেকেইনি, এটাই সেই অভিশপ্ত মোহর, যার গায়ে তিনবার থুথু ছিটিয়েছিল বাউন। কিন্তু কেন তার হাতায় আটকাল? কেন পিপেতে পড়ল না?

মোহরটার দিকে কাঁপা কাঁপা হাত বাড়াল ডেকেইনি, খেয়ালই করল না, টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে, তার শরীরের কাঁপুনিতে টেবিল কাঁপছে, মোমের গায়ে ঠেশ দিয়ে রাখা পিস্তলটা ধীরে ধীরে নড়ছে, ঘুরে যাচ্ছে নলের মুখ। ভারসাম্য হারিয়ে একসময় খটাশ করে পড়ল পিস্তল, গর্জে উঠল। রক্তলাল একটা আগুনের শিখা ছিটকে বেরোল কালো নলের মুখ থেকে, সোজা ছুটে এল ডেকেইনির বুক

লক্ষ্য করে। পোড়া বারুদের গন্ধ বাতাসে।

পুরো তিন সেকেণ্ড যেন কিছুই টের পেল না ডেকেইনি, বুকের কাছে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা শুরু হলো, বাড়ানো ডান হাতটা বাড়ানোই থেকে গেল, চোখ মোহরের দিকে স্থির, কোনরকম প্রতিক্রিয়া নেই তার মাঝে। ব্যথা শুরু হতেই বাঁ হাত চেপে ধরল বুকে, ধীরে ধীরে হাতটা তুলে আনল চোখের কাছে। রক্ত! এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল সে, গুলি খেয়েছে! রক্ত সরে গেল মুখ থেকে, ঝড়ো-বাতাসে-লতার-মত কেঁপে উঠল তার শরীর, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। দুই হাত চেপে ধরেছে ক্ষতস্থানে, দেখতে পাচ্ছে, গল গল করে বেরিয়ে যাচ্ছে তাজা রক্ত, জীবনীশক্তি নিঙড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। কোন উপায় নেই···ঠেকানোর কোন উপায় নেই···

ধীরে, অতি ধীরে সামনের দিকে ঝুলে পড়তে শুরু করল তার মাথা, চোখে রাজ্যের ঘুম, দু'হাত টেবিলে বিছিয়ে তাতে কাত করে মাথা রেখে নীরবে যেন ঘুমিয়ে পড়ল দস্যু-সর্দার। হাতের রক্ত গালে লেগেছে, তাতে একটা মাছি বসল। নড়ল না ডেকেইনি, তাড়ানোর কোন চেষ্টা নেই। আরামে বসে রক্ত চুষতে থাকল মাছিটা। ওটার দেখাদেখি আরেকটা এসে বসল, আরেকটা, আরও একটা···দেখতে দেখতে মাছির জটলা জমে গেল, তবুও নড়ল না এককালের মহাপরাক্রমশালী দস্যু, খুনী লুই।

কেবিনের খোলা জানালায় চকিতের জন্যে একটা শাদা ছায়া দেখা গেল, জানালার একেবারে ধার ঘেঁষে উড়ে গেল অ্যালবেট্রসটা, তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। এসবের কিছুই দেখল না, শুনল লুই ডেকেইনি। গাঢ় নীল আকাশে ধবধবে শাদা ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চলল পাখিটা, দূর হতে দূরে, মিলিয়ে গেল একসময় দিগন্তে।

ইংরেজ ক্যাপ্টেন রিচার্ড হ্যারিসনের মৃত্যুর পর ডেকেইনির জাহাজে যত অঘটন ঘটেছে, সেগুলোর অভিশপ্ত মোহরের জন্যে না-ও হতে পারে। অভিশাপের ফলেই ঝড় এসেছে, 'এটা মনে করারও তেমন কোন কারণ নেই, ঝড়টা হয়তো এমনিতেই আসত, কারণ হঠাৎ করে বাতাস পড়ে গিয়েছিল—ঝড়ের পূর্বাভাস. যার ফলে পালাতে পারেনি ব্রিটিশ জাহাজটা, বারক জাতীয় জাহাজ ওটা, বাতাস ঠিক থাকলে সাস্তা মারিয়ার চেয়ে গতিবেগ অনেক বেশি হত, ধরতে পারত না হয়তো ডেকেইনি। এমনও হতে পারে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ডাকাতদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে ক্যাপটেন হ্যারিসন, আর তাতেই একের পর এক অঘটন ঘটিয়েছে তারা। তবে প্রত্যক্ষভাবে যদিও বা না হয়, পরোক্ষভাবে ওসব অঘটনের জন্যে মোহরটা যে দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, বছরের পর বছর পেরোল, প্রকৃতিতে নানারকম পরিবর্তন এল, গেল। কত সূর্য উঠল, ডুবল, বৃষ্টি এল, বাতাস বইল, এত কিছুই হলো, কিন্তু লুই ডেকেইনির পর আর দীর্ঘ দিন কোন মানুষ এল না সেই দ্বীপে। জাহাজটা আর দেখা যায় না এখন, তার ওপর লতাগুল্ম জন্মেছে, ডাল পাতা পড়েছে, ঢাকা পড়ে গেছে গ্যালিয়ন।

রাজা দ্বিতীয় জেমস যখন ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করছেন, তখন একদিন ভীষণ ঝড় বইল, ছোট্ট খাঁড়ির যে একটা দিক খোলা ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল পাথর ধসে পড়ে, সাগরের পানি ঢোকার আর কোন পথই রইল না। অদ্ভুত একটা কবরে যেন গোর হয়ে গেল জলদস্যুর জাহাজের।

আরও বছর গেল। আরও অনেক জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ল ডেকেইনির জাহাজ। রানী অ্যানের যেদিন অভিষেক হলো, তিনি মাথায় মুকুট পরলেন, সেদিন ভেঙে পড়ল জাহাজের সমস্ত মাস্তুল, লতাপাতা ছিঁড়ে একাকার করল, তারপর ওগুলোও আবার ঢাকা পড়তে শুরু করল নতুন লতা পাতায়। রাজা প্রথম জর্জের আমলে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজ, ওটার আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না বাইরে থেকে।

রাজা দ্বিতীয় জর্জের আমলে একটা জাহাজ এসে ভিড়ল দ্বীপে, পানি ফুরিয়ে গেছে, পানি দরকার নাবিকদের। পানি নিয়ে চলে গেল তারা, দ্বীপের গোপন রহস্য গোপনই রয়ে গেল।

রাজা তৃতীয় জর্জের আমলে কয়েকটা জাহাজ এসে ভিড়ল এক সঙ্গে—ইতিমধ্যে একশো বছর পেরিয়ে গেছে, তারাও জানল না দ্বীপের রহস্য। পানি আর খাবার দরকার, জোগাড় করে নিয়ে চলে গেল।

বছর গেল। রাজা চতুর্থ জর্জের সময় জাহাজডুবি হয়ে এক নাবিক এসে আশ্রয় নিল ডেকেইনির দ্বীপে। পুরো একটা বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাল সে ওখানে। কিন্তু এতদিনেও দ্বীপের গোপনীয়তা গোপনই রইল তার কাছে। একদিন একটা জাহাজ এল, সেই জাহাজে করে দেশে ফিরে এল নাবিক ভিখিরির মত মরার জন্যে। কোনদিনই জানল না, সাত রাজার ধন হাতের কাছেই ছিল তার একটি বছর।

বছর পেরোল। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্ব শেষ হলো, এলেন রানী ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডও গেলেন, পঞ্চম জর্জ গেলেন, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলেন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড, তখনও দ্বীপ তার গোপনীয়তা ফাঁস করল না। রাজকোষের মোহরের একটা মস্ত স্তূপ লুকিয়েই রেখে দিল খাঁড়ির কবর!

একদিন রাজা ষষ্ঠ জর্জ বসলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে। তারও অনেক পরে দ্বীপে নামল কয়েকজন মানুষ।

অবশেষে, প্রায় তিনশো বছর পর গোপনীয়তা ফাঁস না করে আর পারল না জলদস্যুর দ্বীপ।

দুই

চিলেকোঠার জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে বন্দরের কালো পানির দিকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে বব কলিনস। নভেম্বরের সন্ধ্যা নামছে, তার জীবনে আরেকটা বিষণ্ণ সন্ধ্যা। বাইরে মন খারাপ-করে-দেয়া-ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মাত্র পনেরোটা শীতকাল পেছনে ফেলে এসেছে বব, সামনে আরও কত শীত পড়ে রয়েছে কে জানে। ভাবতেই কালো হয়ে গেল তার অপুষ্ট রক্তশূন্য ফেকাসে মুখ।

সুখ কাকে বলে জানে না বব, সোনালি স্মৃতি হয়ে রয়েছে শুধু হাতে গোণা কয়েকটা ঘণ্টা, সেই যে, দূর সাগর থেকে অনেক দিন পর যখন দেখা করতে এসেছিল তার নাবিক বাবা, তখনকার স্মৃতি। বাবার পথ চেয়ে আর কখনও দিন গোণার প্রয়োজন হবে না, রোজ সকালে খবরের কাগজের পাতা উল্টে 'সী-ওয়েভ' জাহাজটার টাইম-টেবল দেখারও কোন কারণ নেই আর। পানি জমল চোখের কোণে, ফোঁটা বড় হয়ে গাল বেয়ে নামল, চিবুক থেকে ঝরে পড়ল টপটপ, কিন্তু মুছল না বব, পাথর হয়ে গেছে যেন।

এই চিলেকোঠায়ই ববের জন্ম। তার মা যখন মারা গেল তখন তার বয়েস তেরো, বাবা দূর সাগরে, কোন খোঁজখবর নেই, সেই থেকেই জীবনযুদ্ধে বব একা, খবরের কাগজ বিক্রি করে পেট চালায়। তার ছোট করে ছাঁটা সোনালি চুলে সন্ধ্যার ছায়া, ঘন নীল মায়াময় চোখের তারা নিষ্প্রভ।

খবরের কাগজে জাহাজ দুর্ঘটনার কথা জানল যে-রাতে বব, দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি, বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ করেছে সারা রাত। বাবার মঙ্গল কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে। কয়েক হপ্তা পর এল সুসংবাদ, সী-ওয়েভের দু'তিন জন ভাগ্যবানের মাঝে তার বাবা একজন, সুস্থ হয়ে উঠছে বোসটনের এক হাসপাতালে। তখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করেছিল তার, কিন্তু গাড়ি ভাড়া জোগাড় করতে পারেনি।

এটা কয়েক হপ্তা আগের ঘটনা। তারপর, এই ঘণ্টাখানেক আগে এসেছে দুঃসংবাদ, খবর নিয়ে এসেছে এক নাবিক, অনেক খুঁজেপেতে বের করেছে ববের চিলেকোঠা। একটা চিঠি নিয়ে এসেছে ববের বাবার কাছ থেকে, ওই তো, ঘরের কোণে পুরানো নড়বড়ে টেবিলটায় পড়ে আছে খামে ভরা চিঠিটা। মুমূর্ষু এক নাবিকের শেষ অনুরোধ ফেলতে পারেনি আরেক নাবিক, পৌঁছে দিয়েছে চিঠিটা। লোকটা দেরি করেনি, দু'চারটা কথা বলেই বিদায় নিয়েছে, তার নামও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

নাবিকটা বলে গেছে, হাসপাতালে মারা যায়নি ববের বাবা, মারা গেছে সাগরতীরের ছোট্ট এক সরাইখানায়। ভাল হয়ে উঠেছে তখন কলিনস, বন্ধুত্ব হয়েছে নাবিকের সঙ্গে, দু'জনে মিলে আবার জাহাজে চাকরি খুঁজেছে, পেয়েও গিয়েছিল চাকরি। পরদিনই চলে যেত সরাইখানা ছেড়ে, কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ঘটনা। গভীর রাতে পাশের ঘরে গোঙানি শুনে ঘুম ভেঙে যায় নাবিকের, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে কলিনস, রক্তে মাখামাখি, পিঠে বিঁধে আছে একটা বড় ছুরি। নাবিককে দেখে কাছে ডাকল, একটা চিঠি হাতে তুলে দিয়ে অনুরোধ করল, ওটা যাতে তার ছেলের কাছে পৌঁছে দেয়, ববের চিলেকোঠার ঠিকানাও দিল বিড়বিড় করে কোনমতে।

নাবিক কি মিছে কথা বলেছে? কিন্তু কেন বলবে? না, তেমন কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না বব।

ভয়ে চিঠিটা খুলছে না সে, এখনও ক্ষীণ আশা রয়েছে, তার বাবা মারা যায়নি। কিন্তু চিঠি খুলে পড়লেই হয়তো ওই আশাটুকুও থাকবে না। গত এক ঘণ্টায় বার

বার চিঠিটা হাতে নিয়েছে সে খোলার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি, আবার রেখে দিয়েছে। ভারি বেশ পুরু চিঠি, খামের ওপর পেনসিলে অস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে ববের নাম-ঠিকানা। বাবার হাতের লেখা চেনে বব, খামের ওপরে লেখার সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। না মেলারই কথা। আহত অসুস্থ একজন লোক লিখতে যে পেরেছে, এই যথেষ্ট, হাত কেঁপেছে, গুটি গুটি করে সুন্দর অক্ষরে লিখবে কি করে?

জাহাজে ভেঁপুর তীক্ষ্ণ শব্দে চমক ভাঙল ববের, জানালা থেকে নাক সরাল। দেখল, গভীর সাগরে চলাচলকারী একটা ট্র্যাম্প স্টীমার ধীরে ধীরে এসে লাগছে বন্দরে, ধূসর অন্ধকারে মস্ত এক জলদানব যেন উঠে এসেছে সাগরের তল থেকে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ববের, দৃশ্যটা মোটেই সুখকর নয়, এই মুহূর্তে আরও খারাপ লাগছে, বিষণ্ণতর করে তুলেছে পরিবেশ। বাইরে বৃষ্টিপাত আরও হীম হয়েছে, ধোঁয়াটে একটা ভেজা চাদর যেন ঝুলে রয়েছে বাতাসে। রাস্তাঘাটে প্যাচপ্যাচে কাদা, হুসহুস করে পানি ছিটিয়ে কদাচিত চলে যাচ্ছে একআধটা গাড়ি। বাড়িঘরে আলো জ্বলে উঠছে, ঘোলাটে হলুদ মিটমিটে আলো।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। বিরক্তিকর দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানোর সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল বব, মনে পড়ল, এমনি এক সন্ধ্যায়ই সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ উঠেছিল মচমচ করে, দরজা খুলে গিয়েছিল ঘরে ঢুকেছিল তার বাবা। মনে আশার দোলা, আহা, এখনও যদি তাই হত!

চিলেকোঠার দরজার কাছে এসে থামল পায়ের শব্দ। কে? নাবিক কি আবার ফিরে এসেছে? ভুলে গিয়েছিল কোন কথা বলার জন্যে এসেছে? কি জানি কেন, প্রথমেই চিঠিটার ওপর চোখ পড়ল ববের, এক লাফে গিয়ে খামটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল পুরানো কাগজপত্রের স্তূপে। ঠিক এ সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

লোকটাকে দেখে পিছিয়ে গেল বব। হিমশীতল চোখে তাকিয়ে রইল আগন্তুক এক মুহূর্ত, তারপর ঘরে ঢুকল। মানুষ না, যেন এক গরিলা। চওড়া কাঁধ, লম্বা রোমশ হাত হাঁটু ছুঁয়েছে প্রায়, মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে। আধুনিক মানুষের সঙ্গে চেহারার মিল খুবই কম, সভ্য মানুষের পোশাক পরে গুহা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে যেন এক প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব। বাঁ কানের নিচ থেকে কাস্তের মত বাঁকা হয়ে এসে ঠোঁটের কোণে মিশেছে গভীর কাটা দাগ। ঘন ভুরু, চুল আর গায়ের রোমের মতই লালচে। ময়লা নীল জারসি দেখেই অনুমান করা যায়, লোকটা নাবিক।

স্থির দৃষ্টিতে একে অন্যকে দেখল দু'জনে।

'নাম কি?' খসখসে গলা লোকটার।

'বব···বব কলিনস,' দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর, গলা কাঁপছে তার।

'রিক কলিনসের ছানা?'

মাথা ঝাঁকাল বব।

'সী-ওয়েডে চাকরি করত।'

'হ্যাঁ।'

'রলি বার্ট দেখা করতে এসেছিল, না?'
'কি নাম বললেন?'
'বার্ট, রলি বার্ট, নাবিক। একটু আগে এসেছিল?'
'হ্যাঁ, একজন নাবিক এসেছিল।'
'তোমার বাবার কাছ থেকে কোন চিঠি এনেছে?'
'হ্যাঁ।'
'কোথায় ওটা?' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে লোকটার হঠাৎ, পিস্তলের গুলি ফাটাল যেন।
'কে...কেন...'
'প্রশ্ন কোরো না!' ধমকে উঠল লোকটা। 'কোথায়?'
'কি করবেন?' সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল বব।
'কোথায়!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।
জ্বলে উঠল ববের নীল চোখ, কঠিন হলো চোয়াল। 'বলব না।'
পকেট থেকে ছুরি বের করল লোকটা, বোতাম টিপতেই ক্লিক করে খুলে গেল লম্বা বাঁকানো ফলা। 'বলবে না, না?'
ঝকঝকে মারাত্মক ফলাটার দিকে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছে বব, সরাতে পারছে না দৃষ্টি।
সামনে বাড়তে শুরু করল নাবিক, সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে শরীর, হিংস্র জানোয়ারের মত ঠোঁট ছড়িয়ে গেছে দু'পাশে, বেরিয়ে পড়েছে দুই সারি ক্ষয়ে যাওয়া হলদেটে দাঁত। এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।
পিছিয়ে এল বব, হাত ঠেকল পেছনের দেয়ালে। ভয়ংকর একটা মুহূর্ত দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, পরক্ষণেই ঘরের একমাত্র চেয়ারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। চোখের পলকে মাথা নিচু করে ফেলল নাবিক, চেয়ারটা গিয়ে লাগল উল্টোদিকের জানালায়।
ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙল, শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ছুটে জানালার কাছে এসে বাইরে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল বব, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' নিচের অন্ধকারে কেউ তার চিৎকার শুনল কিনা বোঝা গেল না।
লাফিয়ে ববের পেছনে এসে দাঁড়াল নাবিক।
শেষ মুহূর্তে পেছনে ফিরে তাকাল বব। ছুরি চালিয়েছে লোকটা। ঝট করে বসে পড়ল সে, কোনমতে ছুরি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচল। ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে গেছে নাবিক, সুযোগটা কাজে লাগাল বব। নাবিকের বগলের তলা দিয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে, তাড়া খাওয়া খরগোশের মত দিকবিদিক হুঁশ হারিয়ে লাফিয়ে পড়ল সিঁড়িতে, একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে চলল নিচে, অন্ধকারে পা ফসকে পড়লে যে ঘাড় ভেঙে মরবে, সে খেয়াল নেই।
পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস বা সময় কোনটাই নেই ববের, সিঁড়ির একেবারে শেষ মাথায় এসে পড়ল। শূন্য হলঘর, ওপাশে দরজা। এক ছুটে হল পেরোল সে, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল ভেজানো দরজা, লাফিয়ে এসে নামল পথে।

কোন দিকে তাকানোর ফুরসত নেই, সোজা সামনে ছুটল, মোড়ের লাইট পোস্টের কাছে প্রায় সময় একজন পুলিশকে পাহারায় থাকতে দেখেছে, তাকেই এখন দরকার।

দশ গজও যেতে পারল না বব, তার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার গায়ে। আবছা অন্ধকারে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মানুষ, একজন বড়, অন্য দুজন তারই মত কিশোর। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বব, খপ করে তার হাত চেপে ধরে আটকাল লোকটা। লোহার সাঁড়াশি দিয়ে যেন কেউ কব্জি জেপে ধরেছে ববের।

'হোকে!' বাজখাঁই গলা বিশালদেহী দানবটার। 'কি হয়েছে, খোকা? ভূতে তাড়া করেছে?'

গলা শুনেই বুঝল বব, চোরডাকাত নয়, ভদ্রলোকের হাতেই পড়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওখানে…ওখানে, আমার ঘরে একটা লোক…'

'লোক?' হাসল লোকটা। 'লোক তো আর ভূত না, ঘাড় মটকে…'

'আরেকটু হলেই খুন করত আমাকে!' তিক্ত কণ্ঠে বলল বব।

'খুন!'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে?'

'ছুরি মেরে।'

'কেন?'

'ওর কথায় রাজি হইনি, তাই।'

'কি করতে বলেছিল?' জিজ্ঞেস করল এক কিশোর।

'একটা চিঠি। আমার বাবার চিঠি। প্লীজ, তোমরা আমার সঙ্গে চলো। চিঠিটা নিতে দিও না ওকে!' অনুনয় করল বব।

'চিঠি!' লোকটার দিকে ফিরল কিশোর। 'বোরিস, চলুন তো দেখি, কি ব্যাপার? আসুন, জলদি!' ববের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, তোমার ঘর দেখাও।'

দ্বিধা করল বব, তারপর বোরিসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার দরজায় এসে দাঁড়াল চারজনে। দরজা বন্ধ। নিচের ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো আসছে। 'এই ঘর!' বলল বব। 'কিন্তু আমি যখন বেরিয়েছিলাম, খোলা ছিল দরজা!'

'দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চয় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়েছে!' বলল আরেক কিশোর।

'না, সম্ভব না!' মাথা নাড়ল বব। 'চল্লিশ ফুট…লাফিয়ে নামতে পারবে না।'

'ভেতরেই আছে তাহলে।' চেঁচিয়ে ডাকল বোরিস, 'এই যে, ভেতরের মানুষ! দরজা খোলো!'

সাড়া নেই।

'এটাই তোমার ঘর তো, খোকা?' সন্দেহ বোরিসের কণ্ঠে।

'নিশ্চয়ই।'
'ভাড়া দাও?'
'নইলে থাকতে দেবে কেন?'
'সত্যি বলছ?'
'খোদার কসম!'
'হোকে! এই, তোমরা সরে দাঁড়াও।' দু'পা পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে দরজার ওপর পড়ল যেন হাতি, মড়মড় করে ভেঙে পড়ল পাল্লা।
টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গরিলাটা, হাতে একটা চিঠি, মাত্র পেয়েছে বোধহয়। বোরিসকে দেখে কুঁচকে গেছে ঘন ভুরু। হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল টেবিলে পড়ে থাকা ছুরিটা।
'খবরদার!' ধমকে উঠল বোরিস। 'ঘাড় মটকে দেব ধরে! এখানে কি করছ?'
'সেটা তোমার ব্যাপার না!' শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল গরিলা।
'এই হারামজাদা!' হঠাৎ করেই রেগে গেল সদাশান্ত বোরিস। 'আমার ব্যাপার না তো কি তোর? হারামির বাচ্চা হারামি, এখানে ঢুকেছিস কেন? রাখ্, চিঠিটা রাখ্!'
'যদি না রাখি!' গলায় জোর নেই গরিলার, বুঝতে পারছে, ওই ভালুকের সঙ্গে লাগতে যাওয়া উচিত হবে না।
'হাত দুটো ভাঙব আগে, পা খোঁড়া করব, এরপর নিয়ে যাব পুলিশের কাছে।'
ছুরির দিকে হাত আরেকটু বাড়ল গরিলার।
দুই লাফে কাছে চলে এল বোরিস, চেপে ধরল কব্জি, একটানে সরিয়ে আনল টেবিলের কাছ থেকে। কব্জিতে বেকায়দা এক মোচড় দিতেই চিঠিটা খসে পড়ল নাবিকের হাত থেকে, ব্যথায় উহ্ করে উঠল। লোকটাকে মাথার ওপর তুলে নিল বোরিস, তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল। দড়াম করে মেঝেতে পড়ল গরিলা, কেঁপে উঠল সারা বাড়ি।
কোমরে হাত দিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে কোনমতে বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়াল নাবিক, জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'আ-আমি দেখে নেব তোকে...'
ধরার জন্যে আবার হাত বাড়াল বোরিস।
এক লাফে পিছিয়ে গেল নাবিক। একে একে নজর বোলাল তিন কিশোরের ওপর, বোরিসের দিকে তাকাল আবার। ফিরে চাইল টেবিলে রাখা ছুরির দিকে, মেঝেতে পড়া চিঠির দিকে। দ্বিধা করল। তারপর হেঁটে গেল দরজার দিকে, বারান্দায় বেরিয়ে ফিরে তাকাল। শাসাল, 'আমি ভুলব না! মনে রাখিস, দৈত্য...!'
ঘুসি বাগিয়ে এক পা বাড়ল বোরিস।
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে সিঁড়িতে নামল নাবিক। দুপদাপ শব্দ তুলে নেমে চলে গেল।
'কি ব্যাপার?' ভুরু নাচাল প্রথম কিশোর ববের দিকে চেয়ে। 'বাড়িতে কেউ নেই নাকি?'
'না,' মাথা নাড়ল বব। ভালমত দেখল কিশোরকে। এক বোঝা কোঁকড়ানো

চুল মাথায়, অপূর্ব সুন্দর দুটো কালো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। 'বেড়াতে গেছে। বাড়ি পাহাড়ায় রেখে গেছে আমাকে।'

'এই সুযোগে ডাকাতি করতে এসেছিল ডাকাতটা!' হাসল অন্য কিশোর—কুচকুচে কালো মুখে নিষ্পাপ হাসি, ম্লান আলোয় ঝকঝক করে উঠল শাদা দাঁত। 'খাইছে, বোরিস, আপনার সিনেমায় নামা উচিত। যা একখান আছাড় দিয়েছেন না ব্যাটাকে, জনি ওয়াইজমুলার ফেল। সিনেমায় টারজানের অভিনয় দারুণ করতে পারবেন!'

মুসার কথায় কান নেই কিশোর পাশার, নিচু হয়ে তুলে নিল চিঠিটা। ববের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার বাবার চিঠি! নিশ্চয় মূল্যবান কোন খবর আছে?'

'মূল্যবান! হ্যাঁ, তা বলতে পারো,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল বব। 'দুনিয়ায় একটি মাত্র লোক যে আমাকে ভালবাসত, তার হাতের ছোঁয়া তো আছে!'

'মানে?'

'বাবা মারা গেছে!' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বব। 'তার···শেষ চিঠি!'

ববের কাঁধে হাত রাখল মুসা আমান। কথা জোগাল না মুখে।

বব একটু শান্ত হলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিটা এখনও খোলনি কেন? সময় পাওনি?'

'পেয়েছি,' ঘাড় নাড়ল বব। 'খুলিনি। খুললেই তো সব আশা শেষ।'

ববের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছে কিশোর। গলায় সহানুভূতি ঢেলে বলল, 'যা ঘটে গেছে, গেছে, তাকে তো মেনে নিতেই হবে। এই দেখো না, আমিও তো তোমারই মত, আমার তো মা-বাবা এক সঙ্গে গেছে! গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে।'

কিশোরের দিকে চেয়ে কি ভাবল বব কে জানে, কিন্তু আর কাঁদল না। চোখ মুছল।

'এখন কি করবে? থাকবে এখানেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি জানি! ভয় লাগছে! আবার যদি সে ফিরে আসে?'

'তোমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই? বন্ধু-বান্ধব?'

'না।'

'টাকা? হোটেলে থাকার মত?'

'না।'

'এক রাতও না?'

'না।'

'হুঁ!' বিড়বিড় করল কিশোর, 'শোচনীয়···হ্যাঁ, তো কোথায় থাকবে আজ রাতে?'

'শুয়ে থাকব গিয়ে বাগানের কোন একটা কুঁড়েতে, যদি খোলা পাই।'

'কোথায়?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

'বাগানে! জিরোনোর জন্যে কুঁড়ে থাকে না, ওগুলোরই কোন একটাতে···'

'ইয়াল্লা! মাথা খারাপ! এই শীতের মধ্যে···'

'ঠেকায় পড়ে আগেও থেকেছি···'

'এক কাজ করো না,' প্রস্তাব রাখল কিশোর, 'চলো, কোন হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিই আগে। খিদে পেয়েছে আমার। তোমারও নিশ্চয়। তারপর ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে, কোথায় থাকবে। কি বলো?'

'কিন্তু আমার কাছে তো পয়সাকড়ি...'

'সেটা তোমার ভাবতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমাকে বন্ধু ভাবতে আপত্তি আছে?'

চুপ হয়ে গেল বব। ধীরে ধীরে আলো ফুটল নীল চোখের তারায়, হাসল, খুব মিষ্টি হাসিটা। 'না, কোন আপত্তি নেই।' হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি রব কলিন্স।'

'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান। আর ও বোরিস চেকোমাসকি, ব্যাভারিয়ায় বাড়ি।'

হেসে মস্ত ধক থাবা বাড়িয়ে দিল বোরিস, ববের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। বোরিসের ধারণা আলতো ঝাঁকুনি দিয়েছে, কিন্তু ববের মনে হলো কাঁধের কাছ থেকে তার হাতটা খসে চলে আসবে।

'আচ্ছা,' কিশোর বলল, 'এদিকে কোন ভাল হোটেল আছে, মানে, ভাল খাবার পাওয়া যায়? আমি ভাই মুসলমান, মুসাও। কিছু মনে কোরো না, শুয়োর-টুয়োর খেতে পারব না। আছে?'

গাল চুলকাল বব। একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, 'আছে, বন্দরের ধারে। নানা দেশের নানা জাহাজ আসে, অনেক রকম লোক, একেক জন একেক রকম খায়...কিন্তু, দাম অনেক বেশি।'

'কুছ পরোয়া নেই,' হাত নাড়ল কিশোর। 'টাকা আছে আমার কাছে। চলো, খিদেয় নাড়ি জ্বলছে।'

তিন

খুশি মনে নতুন বন্ধুদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল বব, অন্যের পয়সায় ভাল খাওয়া তার ভাগ্যে কমই জুটেছে। কয়েক মিনিট পরেই টেবিল ঘিরে বসল ওরা, পায়ের তলায় নরম কার্পেট, মার্বেল পাথরের তৈরি পুরানো ধাঁচের টেবিল, হালকা আলোয় চকচক করছে। প্রায় প্রতিটি টেবিলে লোক আছে, বেশির ভাগই নাবিক। কড়া তামাকের নীলচে ধোঁয়ায় ভারি হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস, খুব ভাল লাগছে ববের এই কোমল উষ্ণতা। কোণের দিকে মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় বসেছে ওরা।

ফেকাসে চেহারার ওয়েইটার এগিয়ে এল।

'গরুর গোশত ভুনা, ভেড়ার কাবাব, পনির, মাখন,' অর্ডার দিল কিশোর, 'আর, মোটা রুটি। গরম গরম।'

লোকটা চলে যেতেই কিশোর বলল, 'খাবার আসতে সময় লাগবে, এই সুযোগে তোমার বাবার চিঠিটা খুলে ফেলি, কি বলো?'

'কিন্তু...ওটাতো ঘরে...'

হেসে পকেট থেকে মোটা খামটা বের করল কিশোর, 'এই যে। নিশ্চয় মূল্যবান

কিছু রয়েছে এতে, নইলে গরিলাটা খুন করতে আসত না তোমাকে। খুলব?'

'খোলো,' মাথা কাত করল বব। 'কিন্তু কিচ্ছু পাবে না। বাবার ধন-দৌলত নেই যে লুকিয়ে রেখে নকশা পাঠাবে।'

ববের কথা কিশোরের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না, হাতের তালুতে নিয়ে খামের ওজন আন্দাজ করছে সে, আপনমনেই মাথা নাড়ল। 'বেশ ভারি! কাগজ ছাড়াও ভেতরে...,' খামের মুখ ছিঁড়তে শুরু করল সে। ছেঁড়া দিকটা কাত করতেই সোনালি ঝিলিক তুলে ঠন করে টেবিলে পড়ল একটা গোল ধাতব জিনিস।

বিদ্যুতের মত ছুটে এল কিশোরের হাত, চাপা দিল জিনিসটা; ঠিক এই সময় এল ওয়েইটার। ধীরেসুস্থে প্লেটগুলো সাজিয়ে রেখে শূন্য ট্রে নিয়ে বিদেয় হলো। সাবধানে এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে করে হাত সরাল কিশোর। শিস দিয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল, 'মিস্টার বব, জলদি এটা পকেটে ঢোকাও!' গোল জিনিসটা ঠেলে দিল। 'জলদি! কেউ দেখে ফেলবে!'

'কী!' হাঁ হয়ে গেছে বব, চোখ বড় বড়। 'কি জিনিস!' তোলার কোন চেষ্টা করল না।

'সোনা,' তালুর নিচে আবার ঢাকল জিনিসটা কিশোর।

'সোনা!' চেঁচিয়ে উঠল বব।

'চুপ! আস্তে! শুনছে!'

'ঠাট্টা করছ!' বিশ্বাস করতে পারছে না বব।

'ঠাট্টা নয়, সত্যি।'

'কি তাহলে? টাকা? ডলারখানেক হবে?'

'টাকাই, তবে এক ডলার নয়, অনেক। আর নিউমিজ্‌ম্যাটিস্‌ট্‌রা পেলে তো লুফে নেবে, চাইলে কয়েকশো ডলারও দিয়ে দিতে পারে, যদি তেমন পুরানো হয়।'

'নিউ...নিউ...'

'নিউমিজ্‌ম্যাটিস্‌ট্‌।'

'হ্যাঁ, নিউমিজ্‌...তা, ওরা আবার কারা?'

'মুদ্রা বেচাকেনা করে যারা, তাদেরকে নিউমিজ্‌ম্যাটিস্‌ট্‌ বলে।'

'কোন আমলের জিনিস এটা?' এতক্ষণে কথা বলল মুসা। 'মোহর?'

'কোন আমলের, ভাল করে না দেখলে বলা যাবে না। মোহরই, সম্ভবত ডাবলুন, পুরানো, স্পেনের স্বর্ণমুদ্রা।'

'হুম,' খেতে খেতে বলল বোরিস, 'তা-ই হবে। মিউজিয়মে দেখেছি এই জিনিস। তা, খাবে, নাকি খালি গল্প করবে? জুড়িয়ে গেল তো সব।'

'ঠিক!' মোহরটা দেখে এতই অবাক হয়েছে, সামনে খাবার রেখেও ভুলে গেছে স্বয়ং মুসা আমান। ভুলটা শোধরাতেই যেন তাড়াতাড়ি খাবারের প্লেট টেনে নিয়ে ডবল ডবল করে মুখে পুরতে শুরু করল। আধসের মত গরুর মাংস শেষ করে থামল, ধীরে সুস্থে রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল, 'ভাল জিনিস পাওয়া গেছে! জলদস্যুরা এসব লুট করে লুকিয়ে রাখত, না?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'সে-সময় স্প্যানিশ ডাবলুনের দাম ছিল প্রচুর, যে

কোন বন্দরে ভাঙানো যেত। বব, মোহরটা নিয়ে পকেটে ভরো, হাত বন্ধ, খেতে পারছি না। আর চিঠিটাও লুকাও।'

লজ্জিত হলো বব। তাড়াতাড়ি মোহর আর খামসুদ্ধ চিঠিটা নিয়ে পকেটে ভরল।

প্লেট টেনে নিতে নিতে বলল কিশোর, 'বব, তোমার বাবাকে যতখানি সাধারণ মানুষ ভাবো, নিশ্চয় ততটা সাধারণ ছিলেন না তিনি। নইলে এই দুর্লভ জিনিস কি করে তিনি জোগাড় করলেন? চিঠিটা পড়তে দেবে আমাকে?'

'নাও না, এখুনি পড়ো,' পকেটে হাত ঢোকাতে গেল বব।

'আরে না না, এখন না,' ববের হাত চেপে ধরল কিশোর। 'এত লোকের সামনে না। কার মনে কি আছে কে জানে!' একটুকরো মাংস চিবিয়ে গিলে নিল। 'আরেক কাজ তো করতে পারি, তুমি আজ রাতে আমার বাড়িতে মেহমান হলে। সেখানেই পড়ব চিঠিটা।'

'দারুণ প্রস্তাব! আমার জন্যে এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে, অন্তত আজ রাতে? কিন্তু তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না-তো?'

'বিন্দুমাত্র না। বাড়িতে শুধু চাচা আর চাচী, অনেক জায়গা। রবিন আর মুসা তো প্রায়ই থাকে আমার সঙ্গে।'

'রবিন?'

'আমাদের আরেক বন্ধু, গেলেই দেখবে,' জবাবটা দিল মুসা।

খেতে খেতেই কথা চলল, বব বলল, 'ইস যদি এক ব্যাগ ডাবলুন পেয়ে যেতাম! আমার কি আর সেই কপাল হবে!'

'হয়েও যেতে পারে,' পনিরের বড় একটা টুকরো নিয়ে কামড় বসাল মুসা। 'কার কপালে কি আছে, কে জানে!'

'তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক,' হাসল বব।

'ফুলচন্দনের দরকার নেই,' হাত নাড়ল মুসা। 'আপাতত বড়সাইজের একখানা চকলেট আইসক্রীম দরকার। এই মিয়া, এই, এদিকে,' ওয়েইটারকে ডাকল সে আইসক্রীমের অর্ডার দেয়ার জন্যে।

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে আইসক্রীম?' বব অবাক।

'ঠাণ্ডা কোথায়?' দু'হাত নাড়ল মুসা। 'আর হলেই বা কি? গরমের মধ্যে চা-কফি খায় না লোকে, ঠাণ্ডার মধ্যে আইসক্রীম খেলে দোষ কি?'

অকাট্য যুক্তি, এরপরে আর কথা চলে না।

'তুমি নাও, আমার লাগবে না,' কিশোর বলল।

'আমারও না,' বলল বব।

বোরিসের দিকে তাকাল মুসা, 'নেবেন?'

'বেশি না, দুটো,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল বোরিস।

হেসে ফেলল মুসা, 'আমি একটার বেশি পারব না।' ওয়েইটারের দিকে ফিরল। 'এই মিয়া, তিনটা। বড় দেখে এনো।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আগের কথায় ফিরে এল বব, 'এই মোহরটা কি

জলদস্যুদের কাছে পাওয়া গেছে?'

'তোমার বাবার চিঠি পড়লেই জানা যাবে,' কিশোর বলল। 'বাক্যানিয়ারদেরও হতে পারে।'

'বাক্যানিয়ার!'

'ওরাও জলদস্যু, তবে সাধারণ জলদস্যুর সঙ্গে একটু তফাৎ আছে,' ন্যাপকিনে হাত মুছল কিশোর। 'চা খাবে?'

'তা খেতে পারি।'

আইসক্রীম নিয়ে এসেছে ওয়েইটার। তার দিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'দু'কাপ চা, দুধ বেশি।'

'হ্যাঁ,' চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল কিশোর, 'বাক্যানিয়াররা আগে জলদস্যু ছিল না। একটা সময় ছিল, যখন জাহাজের চেয়ে নাবিক বেশি হয়ে গিয়েছিল, ফলে জাহাজে চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশি দিন বেকার বসে থাকল না। বেশ কিছু ইংরেজ আর ফরাসী নাবিক, অন্য পেশা নিয়ে মেকসিকো উপকূলে চলে গেল তারা। তার আশেপাশে তখন স্প্যানিয়ার্ডদের রাজত্ব। মেকসিকো আর পেরুতে সোনার খনি আবিষ্কার হয়েছিল তারও আগে, ওই সময় হিসপ্যানিওলা—আজকের হাইতি দ্বীপে ছিল স্প্যানিয়ার্ডদের আখড়া। সোনার নাম শুনে লাফিয়ে উঠল তারা। ভাবল, খামোকা বসে থেকে লাভ কি, অনেক দেশের লোক তো যাচ্ছে সোনা খুঁজতে, তারাই বা ভাগ্যটা একটু যাচাই করে দেখে না কেন? বেরিয়ে পড়ল তারা, তাদের পোষা গরু-ছাগল আর শুয়োরের দল দ্বীপেই ফেলে রেখে যেতে হলো যানবাহনের অভাবে। মানুষ নেই, ধীরে ধীরে বুনো হয়ে উঠল জানোয়ারগুলো, বংশ বিস্তার করে চলল দ্রুত, আর কিছু দিন থাকলে খাওয়ার অভাবে হয়তো নিজেদের মাংসই খেতে শুরু করত ওরা, এত বেশি হয়ে গিয়েছিল, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। এই সময় গিয়ে হাজির হলো বেকার নাবিকেরা। ওসব জানোয়ার মেরে গোশত শুকিয়ে জাহাজীদের কাছে বিক্রি শুরু করল। খাবার আর পানির অভাব হলেই ওপথে চলাচলকারী জাহাজ হিসপ্যানিওলায় নোঙর করে, তাদের কাছে মাংস বিক্রি করে বেশ দু'পয়সা কামাই হতে লাগল বেকারদের। শুকনো গরুর মাংসকে ফরাসীরা বলে 'বুকাঁ', বেকারদের নাম রাখা হলো 'বুকাঁইয়া', এটা থেকেই এসেছে ইংরেজি 'বাক্যানিয়ার' শব্দটা।

যা-ই হোক, বেশ আরামেই আছে বাক্যানিয়াররা, ওরকমই থাকত, যদি স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের না ঘাঁটাত। মাথায় ভূত চেপেছিল ব্যাটাদের, তাই নিরীহ নাবিকগুলোকে খোঁচাতে গিয়েছিল। ওটা তখন স্প্যানিয়ার্ডদের এলাকা, তারা মনে করল, তাদের রাজত্বে অন্য দেশের লোক থাকবে কেন? উচ্ছেদ করো হিসপ্যানিওলায় উড়ে এসে জুড়ে বসা বিদেশীগুলোকে। ব্যস, এসে খুনজখম শুরু করে দিল। শুরুতে কিছুদিন সহ্য করল বাক্যানিয়াররা, কিন্তু পরে রুখে দাঁড়াল, সে এক প্রচণ্ড রক্তারক্তি কাণ্ড। স্প্যানিয়ার্ডরাই জিতল, প্রথমে তাই মনে হয়েছিল অবশ্য। বাক্যানিয়াররা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল কাছের আরেকটা দ্বীপে, একটা পাথুরে দ্বীপে, টিলাটক্কর আর লুকানোর জায়গা আছে প্রচুর। দ্বীপটার নাম টরটুগা।

প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তাদের মনে। শুধু ভেবেই ক্ষান্ত রইল না, নৌকা বানানো শুরু করল। শিগগিরই দল বেঁধে চড়াও হতে শুরু করল স্প্যানিয়ার্ডদের সদাগরী জাহাজের ওপর, লুটপাট তো করলই, যে জাহাজকে আক্রমণ করল, তার একটা লোকও জ্যান্ত রাখল না, সুযোগই দিল না কোনরকম, কচুকাটা করল। জাহাজ জোগাড় হতে লাগল, সেই সঙ্গে অস্ত্র, রসদ, খাবার-দাবার। খুব শিগগিরই টরটুগায় দুর্ভেদ্য এক দুর্গ বানিয়ে ফেলল ওরা। তারপর আশপাশের কয়েকটা দ্বীপে দুর্গ বানাল, খুবই জোরদার করে ফেলল প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

'তারপরে যা ঘটার তা-ই ঘটল,' চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা পিরিচে নামিয়ে রাখল কিশোর। 'দেশে দেশে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, বাক্যানিয়াররা স্প্যানিশ জাহাজ লুট করে সোনার পাহাড় জমিয়ে ফেলছে। ব্যস, বাঘা বাঘা সব চোর-ডাকাতের টনক নড়ে গেল, দলে দলে ছুটে আসতে শুরু করল তারা সোনার পাহাড়ের ভাগ নিতে। বাক্যানিয়াররা স্বাগত জানিয়ে দলে টেনে নিল তাদের, দল ভারি করল, শক্তিশালী করল। মাংস বেচে সংসার চালানোর ধারেকাছেও গেল না আর, ডাকাত হওয়ার মজা বুঝে গেছে, ডাকাতই থেকে গেল। প্রায় রাতারাতি গজিয়ে উঠল জলদস্যুদের আরেকটা রাজধানী, জ্যামাইকার পোর্ট রয়্যালে। জান খারাপ করে ছাড়ল স্প্যানিয়ার্ডদের—তাদের তখন ছেড়েদে-মা-কেঁদে-বাঁচি অবস্থা। কিন্তু বাক্যানিয়াররা ছাড়ল না, দিনকে দিন আরও দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। জানে, স্প্যানিশরা ধরতে পারলে পুড়িয়ে মারবে, আর ইংরেজরা ধরলে ফাঁসিতে লটকে দেবে। তাই ধরা পড়ার মত কাজই করল না ওরা। যে জাহাজকেই ধরল, তার লোকজনকে একেবারে শেষ করে দিল। তাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না স্প্যানিশ সরকার, দমন করা তো দূরের কথা। ইংরেজরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, কিন্তু কিছু করতে পারল না। এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল বাক্যানিয়াররা, জাহাজ আক্রমণ ছেড়ে শেষে স্প্যানিশ মেইনের উপকূলে গিয়ে আক্রমণ চালাল। তাদের দলপতি কুখ্যাত মরগান, আঠারোশো খুনে ডাকাত নিয়ে একবার পানামাতক ধাওয়া করে এল।' থামল কিশোর।

'তারপর?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল বোরিস, গল্প শোনার আগ্রহ যার একদম নেই, সে-ও আইসক্রীম খাওয়া ভুলে গেছে।

'শেষে ইংরেজ সরকার এক বুদ্ধি করল,' আবার শুরু করল কিশোর, 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিল। যারা দস্যুতা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজদের দলে যোগ দেবে, তাদেরকে মাপ করে দেবে ইংরেজ সরকার। লোভনীয় প্রস্তাব, অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করল ইংরেজদের কাছে, কেউ কেউ গ্রামে বিয়ে-থা করে চাষাবাদ শুরু করল, দু'একজন ব্যবসাও ফাঁদল, তবে বেশিরভাই যোগ দিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে। সবচেয়ে বড় খুনেটাকে, মরগানকে নাইট উপাধি দিয়ে জ্যামাইকার গভর্নর বানিয়ে দেয়া হলো। এরপর কি করা উচিত, ভালমতই জানে মরগান, যারা দস্যুতা ছেড়ে তার দলে যোগ দিল না, তাদের সবাইকেই ধরে নির্বিচারে ফাঁসিতে লটকে দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওই অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজীরা। কমে এল জলদস্যুতা।

একেবারে বন্ধ হলো স্টীম ইঞ্জিন আসার পর, পালের জাহাজ নিয়ে ওগুলোর সঙ্গে দৌড়ে পারত না ডাকাতেরা, বাধ্য হয়ে ডাকাতি ছাড়তে হলো।'

'ইস্, কি আরামেই না ছিল!' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বব। 'গেল ব্যাটারা ভেড়া বনে!'

'আরে!' হেসে বলল কিশোর, 'তুমি তো লোক সুবিধের নও।' ডাকাতদের জন্যে দুঃখ করছ। সুযোগ পেলে হয়ে যেতে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। খবরের কাগজ ফেরি করার চেয়ে অনেক ভাল।'

ববের জন্যে দুঃখ হলো কিশোরের। 'তা ঠিকই বলেছ, কিন্তু ধরা পড়লে যে ফাঁসিতে ঝোলাত? কিংবা পুড়িয়ে মারত?'

'না খেয়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া ভাল না?'

জবাব দিতে পারল না কিশোর। বিল এল, প্লেটে কয়েকটা নোট রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। অন্যেরাও উঠল।

বাইরে বেরিয়ে রাস্তা পেরোতে গিয়েই বাধল বিপত্তি। ববের প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল একটা লরি, হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে আনল মুসা, আরেকটু হলেই চাকার নিচে চলে যেত বব।

'আরে! কি ব্যাপার!' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। 'এতবড় একটা লরি আসছে, দেখলে না! গেছিলে তো!'

'কি জানি!' বেশ নাড়া খেয়েছে ব্যাপারটায় বব। 'পথেই তো আমার কাজ, সারাদিন পথে পথে ঘুরি, এমন তো কোনদিন হয়নি! আজ হঠাৎ...' কি করে কি ঘটল, বুঝতে পারছে না যেন সে-ও।

'অ্যাকসিডেন্ট রোজ হয় না, হঠাৎ করেই একদিন হয়,' সাবধান করল কিশোর। 'দেখে শুনে পথ চলো এখন থেকে, নইলে মোহর খরচ করার সুযোগ পাবে না।'

হাত তুলে একটা খালি ট্যাক্সি ডাকল কিশোর। বোরিস আর মুসাকে নিয়ে এদিকে এসেছিল সে কিছু পুরানো জিনিস দেখতে। ইয়ার্ডের দুটো ট্রাকের একটা খারাপ হয়ে গেছে, আরেকটা নিয়ে বেরিয়েছেন রাশেদ চাচা। আসার সময় বাসে এসেছে। তিনজনে।

ট্যাক্সিতে উঠল ওরা, বোরিস বসল ড্রাইভারের পাশে, তিন কিশোর পিছনের সীটে।

গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার, বোধহয় অনেক দূর যেতে হবে বলে শুরুতেই গতি অনেক বাড়িয়ে দিল। প্রথম থেকেই ড্রাইভারের আচরণ ভাল লাগেনি কিশোরের, এখন তার এই গতি বাড়ানো আরও অপছন্দ করল। নিচু গলায় সঙ্গীদেরকে বলল, 'ব্যাটা নিশ্চয় মাতাল! এই রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালায় কেউ! দেবে গুঁতো লাগিয়ে কোন গাড়ির সঙ্গে!'

'খুব খারাপ কথা,' ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিল বব। 'মাত্র টাকা পয়সা আসতে শুরু করেছে, এই সময় যদি মরি...হি-হিহ্!' অযাচিত ভাবে কয়েকজন সত্যিকারের বন্ধুকে পেয়ে সব দুঃখ যেন ভুলেই গেছে সে।

'খরচ করার সুযোগ দেবে না তোমাকে ব্যাটা!' রেগে উঠছে কিশোর, বোরিস কিছু বলছে না কেন? বোধহয় এই জোরে ছোটা ভালই লাগছে তার। একটা মোড়ে এসে পড়ল গাড়ি, তবুও গতি কমাল না ড্রাইভার, চাকার কর্কশ শব্দ তুলে পিছলে ঘুরে গেল গাড়ির নাক, একে অন্যের ওপর কাত হয়ে পড়ল তিন কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'বোরিস! আস্তে চালাতে বলুন! মেরে ফেলবে নাকি!'

হেসে উঠল ড্রাইভার, যেন মজার একটা কৌতুক শুনছে, গতি তো কমালই না, বরং আরও বাড়াল।

আশ্চর্য! বোরিস এখনও কিছু বলছে না কেন? কিশোরের মনে হলো, সে নিজেও অযথাই বেশি রেগে যাচ্ছে, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে।

অবশেষে দুর্ঘটনা ঘটেই গেল। একটা ট্রাফিক পোস্টের কাছে লাল বাতি অমান্য করল ড্রাইভার, বাঁদিক থেকে আসা একটা প্রাইভেট কারের পেছনে লাগিয়ে দিল গুঁতো। চাকার তীক্ষ্ণ শব্দ, আঁতকে ওঠা মহিলার ভয়ার্তচিৎকার, দু'চারজন পথচারীর 'গেল! গেল!' রব শোনা গেল কয়েক মুহূর্ত। ভাগ্য ভাল, প্রাইভেট কারটা উল্টাল না, গুঁতো খেয়ে ওটার পেছন দিক সরে গেল আধ পাক।

রাগে অন্ধ হয়ে গেছে কিশোর। এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে, ড্রাইভারের দরজা খুলে তাকে প্রায় চড়ই মেরে বসে, এই অবস্থা। জীবনে যা কখনও করেনি, তাই করে বসল, মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠল ড্রাইভারকে।

ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এল। প্রথমেই দেখে নিল, দুটো গাড়ির কেউ আঘাত পেয়েছে কিনা। অন্য কারোই তেমন কোন চোট লাগেনি, ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছাড়া। তার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। চেহারা ফেকাসে মনে হলো, খুব লজ্জা পেয়েছে।

পকেট থেকে নোটবুক বের করতে করতে বলল পুলিশ, 'কি ব্যাপার? মদ খেয়ে চালাচ্ছিলে নাকি? দেখি, লাইসেন্স দেখি।'

কিশোর বলল, 'মদই খেয়েছে! কত মানা করলাম, আস্তে চালাও, আস্তে চালাও, শুনল না!'

লাইসেন্স বের করে দিয়ে বলল ড্রাইভার, 'না, স্যার, মদ খাইনি! বিশ্বাস করুন! আজ সারাদিন এক ফোঁটাও না! কি জানি হয়ে গিয়েছিল! জীবনে কখনও এরকম হয়নি! কি যে হয়ে গেল হঠাৎ।'

ভুরু কুঁচকে ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত পুলিশ। না, মিছে কথা বলছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি ভাবল, তারপর লাইসেন্সটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'যাও, ছেড়ে দিলাম। এখন থেকে সাবধানে গাড়ি চালাবে। অসুখ-টসুখ করেনি তো?'

'না, স্যার!' কপালের রক্ত মুছছে ড্রাইভার। 'সারাদিন গাড়ি চালিয়েছি, বৃষ্টি তো, খেপও পেয়েছি অনেক। এই একটা খেপেই...আসলে!'

'যাও, ওনাদেরকে নামিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যাও,' পরামর্শ দিল পুলিশ। 'বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছ, ঘুম পাচ্ছে বোধহয়। যাও,' হাত নাড়ল সে।

গাড়ি ছাড়ল আবার ড্রাইভার। গতিবেগ সীমিত রাখল এবার। বলল, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না। সত্যি বলছি, মদ খাইনি। আমার মুখ শুঁকে দেখুন।'

কিশোরও বিশ্বাস করল তার কথা, গাল দিয়েছিল বলে লজ্জা পাচ্ছে। চিমটি কাটতে শুরু করেছে নিজের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে। আনমনেই বলল, 'না, শোঁকার দরকার নেই। কিন্তু···হোটেল থেকে বেরোনোর পর পরই দু'দুটো অঘটন!'

'ভূতের আসর হয়েছে।' অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলল মুসা। 'ড্রাইভারদের ওপর। লরিটা কি করল, দেখলে না?'

'লরিটা ঠিকই আসছিল,' মনে করিয়ে দিল কিশোর, 'ববই আনমনা হয়ে গিয়েছিল।'

'হুঁ!'

এত কাণ্ড ঘটে গেল, বোরিস হাঁ-না কিচ্ছু বলল না, স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে যেন সে। একেবারে চুপ। তার এই ভাবসাব ভাল লাগল না মুসার। সত্যিই কি ভূতের আসর।

চার

তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন কিশোর। বাকি পথটা নিরাপদেই ফিরেছে ওরা। ফিরেই রবিনের বাড়িতে টেলিফোন করেছে কিশোর। তাকে পায়নি, বাবা-মার সঙ্গে খালার বাড়ি গেছে রবিন, পার্টিতে।

থ হয়ে গেছে বব। অল্প কথায় তাকে বলেছে সব মুসা, লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে শখের গোয়েন্দাগিরি করে তারা। দুই সুড়ঙ্গ আর হেডকোয়ার্টার দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে বব। রা সরছে না মুখে।

ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে বসেছে কিশোর, উল্টো দিকে বসেছে মুসা আর বব।

'আর দেরি করে কি হবে?' কিশোর বলল। 'রবিন কখন আসে, ঠিক নেই। এলেও এত রাতে তার মা তাকে এখানে আসতে দেবেন কিনা, সন্দেহ। আমরা পড়ে ফেলি চিঠিটা। সকালে খবর দেব রবিনকে।'

'ঠিক আছে,' সায় জানাল মুসা আর বব।

'বের করো,' ববকে বলল কিশোর।

পকেট থেকে খামটা বের করল বব। ভেতর থেকে বেরোল কয়েক পাতা আধময়লা কাগজ, ঠিক মত ভাঁজ করার সময় পায়নি লেখক, বোঝাই যাচ্ছে। টেবিলে বিছিয়ে হাত দিয়ে ডলে সেগুলোকে সমান করল সে।

'পড়ো,' বলল কিশোর।

'তুমিই পড়ো,' কাগজগুলো ঠেলে দিল বব।

'আমি···আচ্ছা,' কাগজগুলো টেনে নিয়ে আরেক দফা সমান করল কিশোর। জোরে জোরে পড়তে শুরু করলঃ

ডিয়ার বব,

হাসপাতালে বসে লিখছি এ-চিঠি, এখানে আমি মোটামুটি নিরাপদ।

মনে হয় না এটা তোমার হাতে পৌঁছবে, কিন্তু যদি পৌঁছায়ই, পড়ো ভালমত, আমার পরামর্শ মত কাজ করো, হয়তো কোনদিন প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হতে পারবে। আবার বলছি, প্রচুর ধনসম্পদ। সাবধান, কাউকে কিছু বলবে না। চিঠিটা তো দেখাবেই না, তাহলে ধনসম্পদ পাওয়া তো দূরের কথা, প্রাণে বাঁচবে কিনা সন্দেহ। স্রেফ খুন হয়ে যাবে।

খুলেই বলি সব। খুব সুন্দর একটা জাহাজ 'সী-ওয়েড,' ছোট, কিন্তু ভাল। এখন ওটা সাগরের তলায়, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তার বেশিরভাগ নাবিককে। আহা, কি ভাল লোকই না ছিল তারা! সব দোষ ওই শয়তান, মাতাল বিগ হ্যামারের। গরিলার মত শরীর, তেমনি কুৎসিত চেহারা, গালে কাস্তের মত বাঁকা একটা কাটা দাগ আরও বীভৎস, ভয়াবহ করে দিয়েছে মুখটাকে। ভীষণ খারাপ লোক, কতখানি খারাপ, তা তার সংস্পর্শে যারা এসেছে তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

সী-ওয়েডে করে সে-ই আমাদের শেষ যাত্রা। গরিলাটাকে সেদিন জাহাজে উঠতে দেখেই কেন জানি মনে হলো, অঘটন ঘটবে সে-যাত্রায়। আমাদের ফার্স্ট মেট অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জায়গায় হ্যামারকে নেয়া হয়েছে। টার্নার খুব ভাল লোক ছিল, নাবিকদের ভালবাসত, অথচ তার জায়গায় এ-কাকে নেয়া হলো! দেখেই অপছন্দ করলাম আমরা, সী-ওয়েডের নাবিকেরা। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্ত, আমরা আর কি বলব।

জাহাজ ছাড়ল। যাত্রার শুরুতেই যখন ন্যাব লাইটের দেখা পেলাম না, বুঝলাম, কপালে খারাপী আছে। যাব রিও-তে। এমনিতেই ওদিককার সাগরের বদনাম আছে, যখন তখন ঝড় ওঠে, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন উত্তর-পশ্চিম থেকে ধেয়ে এল পাগলা হাওয়া, বড় বড় ঢেউ উঠল, মোচার খোলার মত দোলাতে শুরু করল জাহাজটাকে। নিচে, নাবিকদের কেবিনে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমরা। গরিলা নামল না, ব্রিজে রয়ে গেল। মাতাল অবস্থায় হাল ধরেছে, ঘষা লাগিয়ে দিল একটা স্টীমারের সঙ্গে। ভাগ্য ভাল, সামনাসামনি গুঁতো লাগায়নি, তাহলে ওখানেই হয়তো মরতাম আমরা। ক্যাপ্টেনের শরীর বিশেষ ভাল না, ঘুমের বড়ি খেয়ে নিজের কেবিনে শুয়ে আছেন, তাই বোধহয় ঘষা লাগার শব্দ শুনলেন না। আর ভীষণ ঝড়ের মাঝে কেবিন থেকে ওই শব্দ শোনাও যায়নি বোধহয়।

হ্যামারকে টার্নারের মত বিশ্বাস করা উচিত হয়নি ক্যাপ্টেনের। এই যে একটা দুর্ঘটনা ঘটাল, তারপরও হুঁশ হলো না হ্যামারের, মদ গিলেই চলল। আপন খেয়ালে যেদিকে খুশি ভেসে চলল জাহাজ, গরিলাটার কোন খবরই নেই। সে রাতে সারাটা রাত আতঙ্কে অস্থির হয়ে রইলাম আমরা, যে কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে। আমরা ঠিক করলাম

সকালে ক্যাপ্টেনকে জানাব হ্যামারের গাফিলতির কথা। তার মাতলামির জন্যে জাহাজসুদ্ধ সবাই তো আর মরতে পারি না।

কোনমতে রাতটা কাটল। সকালে একজন নাবিক গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জানাল। হ্যামারকে ডেকে খুব একচোট ধমকালেন তিনি, হুঁশিয়ার করে দিলেন, এরপর এ-রকম হলে আর সহ্য করবেন না।

মুখ কালো করে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বেরোল গরিল্লা, তারপর শুরু হলো তার অত্যাচার। সে কী অত্যাচার! পরের পনেরোটা দিন যে কী যন্ত্রণায় কাটল! জাহাজের পরিবেশকে নরক বানিয়ে ছাড়ল শয়তানটা। শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, বিনা রক্তপাতে বুঝি আর রিওতে পৌঁছানো সম্ভব হলো না। সে যা শুরু করেছে, যে-কোনো মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে। পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠল, যখন রহস্যজনক ভাবে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। ধরাধরি করে তাঁকে কেবিনে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো। জাহাজের দায়িত্ব পুরোপুরি এখন গরিলার হাতে। আরও মরলাম আমরা। জাহাজ আর জাহাজ রইল না, দোজখ হয়ে উঠল।

আসল কাহিনী শুরু হলো এরপর। পথ হারাল জাহাজ। জাহাজের গতিপথ ঠিক করার কোন চেষ্টাই করল না হ্যামার, সারাক্ষণ মদ নিয়ে রইল। গত ক'দিন থেকেই আবহাওয়া খারাপ। অবশেষে আঘাত হানল হারিকেন। সে-কী ঝড়! আমার এত দিনের নাবিক-জীবনে এমন ঝড় আর দেখিনি। দক্ষিণ-পুব থেকে বইল প্রচণ্ড ঝড়, সাগরের ঢেউ তো না, যেন একেকটা হিমালয় পর্বত। ভাল জাহাজ বলেই টিকে রইল সী-ওয়েড কোনোমতে, নইলে পয়লা ধাক্কাতে তলিয়ে যাওয়ার কথা। গল গল করে পানি ঢুকছে জাহাজে, হাত-পাম্প দিয়ে সেচে কুলিয়ে উঠতে পারছি না আমরা। পানি ঢুকে বয়লারের আগুন গেল নিভে, ইঞ্জিন বন্ধ। ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রধান মাস্তুল ভেঙে ভেসে চলে গেল, সঙ্গে করে নিয়ে গেল অ্যান্টেনা আর কিছু মূল্যবান জিনিস, বিকল হয়ে গেল বেতার যন্ত্র। বিপদ সংকেত যে পাঠাব, সে উপায়ও থাকল না। অসহায় ভাবে ভেসে রইলাম আমরা।

পরের চারটে দিন যেন এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, কোন জাহাজ চোখে পড়ল না। সী-ওয়েডের খোলের জায়গায় জায়গায় ছিদ্র আর ফাটল দেখা দিয়েছে, পানি ঢুকছে, সেচব আর কত? ধীরে ধীরে ডুবছে জাহাজ, বুঝতে পারছি। কিন্তু ঠেকাব কি করে? আমাদের সবার অবস্থা এত কাহিল, কুটোটি সরানোর শক্তি নেই। চারদিন চার রাত শুধু পানি সেচেছি, ঝড়ের সঙ্গে ঝুঝেছি, শরীর আর চলছে না, আর পাম্প চালাতে পারছি না, ফলে দ্রুত ডুবছে জাহাজ। আর বেশিক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারব না ওকে।

যখন বুঝলাম, সী-ওয়েডের আয়ু শেষ, পানি আর না সেচে নৌকা

নামালাম। প্রথম নৌকাটায় নামিয়ে দিলাম ক্যাপ্টেনকে। বাতাসের গতিবেগ কমেছে অনেকখানি, কিন্তু ঢেউ বেশ বড় বড়ই রয়েছে। ক্যাপ্টেনের ভাগ্য মন্দ, বিশাল এক ঢেউ এসে নৌকাটাকে তুলে নিয়ে আছাড় মারল জাহাজের গায়ে, এক আছাড়েই চুরমার, চোখের পলকে ফেনা আর ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলাম। দড়ি ধরে নৌকায় উঠতে যাচ্ছিল হ্যামার, ঝুলে রইল ওভাবেই, গাল দিতে দিতে ডেকে উঠে এল আবার দড়ি বেয়ে। নৌকায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যারা উঠেছিল, তাদের একজনকেও দেখা গেল না আর, সবাই তলিয়ে গেছে ঢেউয়ের তলায়।

ডেকে আমার সঙ্গে আর মাত্র চারজন নাবিক বেঁচে আছে। বিগ হ্যামার, পম্পেইয়ের জিম কারনি, বাবুর্চি হ্যারি লুই, আর কিম কারপেনটার, ওই যে, তোমার কিমচাচা, যে আমার সঙ্গে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল, চিনেছ তো? ছোট্টখাট্টো লোকটা, পাকানো মস্ত গোঁফ ছিল, গিলিংহ্যামে বাড়ি, জানো বোধহয়।

আরেকটা নৌকা আছে জাহাজে, সাবধানে নামালাম ওটা। প্রাণ হাতে করে ভয়ে ভয়ে নামলাম ওতে। আগেরটার অবস্থা দেখেছি, তাই হুঁশিয়ার রইলাম, তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনলাম ডুবন্ত জাহাজের কাছ থেকে।

পনেরো পনেরোটা দিন ছোট্ট সেই ডিঙিতে যে কি করে কাটল পাঁচজন লোকের, কী যে কষ্ট, বোঝাতে পারব না। হাতে ধরে ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, তাই বেঁচে আছি! পনেরো দিনের দিন দূরে ডাঙা চোখে পড়ল। ক্যারিবিয়ান সাগরের একটা দ্বীপ, নাম প্রভিডেন্স, দ্বীপটা আমার চেনা। এর আগেও ওখানে নেমেছি একবার, জাহাজে পানি নেয়ার জন্যে। জানা গেল, হ্যামারও চেনে। লম্বাটে একটা দ্বীপ, দুই প্রান্তে বিচিত্র চেহারার পাহাড়। গায়ে শক্তি নেই, তবু ডাঙা দেখে শুধু মনের জোরে দাঁড় তুলে নিয়ে বেয়ে চললাম। কিন্তু তখনও ভাগ্য আমাদের ওপর বিরূপ, তীর ঘেঁষে বয়ে চলা তীব্র স্রোত দ্বীপের গায়ে নৌকা ভিড়তে দিল না, টেনে নিয়ে চলল আবার খোলা সাগরে। দাঁড় ফেলে দিয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়লাম, যেদিকে খুশি যাক ডিঙি, আর কেয়ার করি না। দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে নৌকা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাহিল আমরা, চোখের সামনে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখছি খাবার আর পানির উৎস, তখন আমাদের মনের অবস্থা যে কী, কি করে বোঝাই! ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, জিম কারনি মারা গেছে আগেই, সে-রাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল বেচারা হ্যারি। আমরাও মৃত্যুকে মেনে নিয়ে অপেক্ষা করে আছি, এবার কার পালা আসে!

কিন্তু মরলাম না। স্রোত আমাদেরকে এনে ঠেকাল আরেকটা দ্বীপের গায়ে, আধমরা অবস্থায় নামলাম তীরে। বুঝলাম, আপাতত বেঁচে গেছি।

দ্বীপে প্রচুর নারকেল গাছ আছে, গাছের নিচেই পড়ে আছে অনেক নারকেল। তাড়াতাড়ি নারকেল ভেঙে পানি খেলাম, তারপর খেলাম মিষ্টি শাঁস। অচেনা দ্বীপ, নাম জানি না, তবে জানলে ভাল হত; কেন, একটু পরেই বুঝবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তীরের নরম বালিতেই হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা।

খুব একটা খারাপ থাকতাম না দ্বীপটাতে, যদি গরিলাটা আমাদের সঙ্গে না থাকত। খাবার আর পানি তো পেয়েই গিয়েছিলাম, চুপচাপ এরপর শুধু অপেক্ষা করতাম, ওপথে কোন জাহাজ গেলে কোনভাবে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশে ফিরে আসতে পারতাম আবার। কিন্তু আমাদের জান খারাপ করে ছাড়ল বিগ হারামজাদা। নারকেলের পানি পিপাসা মেটাতে পারে, কিন্তু হ্যামারের মদের নেশা আর তো পারে না। মদের জন্যে পাগল হয়ে উঠল সে, এম নিতেই বদমেজাজী, আরও খারাপ হয়ে গেল। তার মেজাজের জ্বালায় তটস্থ করে রাখল আমাদের সারাক্ষণ।

যা-ই হোক, খাই-দাই, হ্যামারের অত্যাচার সহ্য করি, আর দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখি আমি। অদ্ভুত একটা দ্বীপ। মাইল দশেক লম্বা একটা সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ যেন, চাঁদের পেটটা বেশিই মোটা, পাঁচ মাইল মত হবে।

এক মাস কাটিয়ে দিয়েছি দ্বীপে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ দেখানো শুরু করল হ্যামার, গালাগাল করতে লাগল খাবার পানি এনে রাখিনি বলে। কত আর সওয়া যায়? রেগে গিয়ে বললাম, আমি তার বাপের চাকর নই, দরকার পড়লে নিজে এনে খাকগে। ব্যস, চোখের পলকে ছুরি বের করে তাড়া করল আমাকে। আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই, থাকলেও ওর সঙ্গে পারতাম না, ঝেড়ে দৌড় দিলাম। পেছনে তাড়া করে এলো সে। ছুটতে ছুটতে উঠে এলাম ছোট একটা পাহাড়ে। পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস নেই। আমার ধারণা, ঠিক পেছনেই রয়েছে সে, ধরে ফেলল বলে। সামনে ঘাস-লতার জঙ্গল। সোজা ছুটে গেলাম, কয় পা' এগিয়েছি বলতে পারব না, হড়াৎ করে পড়ে গেলাম নিচে। হঠাৎ যেন দু'ফাঁক হয়ে গেল মাটি, গিলে নিয়ে ঠাঁই দিল আমাকে তার জঠরে। পৌঁছে গেছি বোধহয় পাতাল রাজ্যে!

চোখ মেলে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। আবছা আলো। এ-কি! এ কোথায় এসেছি! স্বপ্ন দেখছি না-তো? অনেক পুরানো একটা কাঠের জাহাজের স্যালুনে পড়েছি, এই জিনিস তো এখন মিউজিয়মের সামগ্রী। আমি এর ভেতরেই রয়েছি, সত্যি তো? চিমটি কাটলাম হাতে, চুল টেনে দেখলাম। না, জেগেই তো আছি।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। এই জাহাজটা এখানে এল কি করে? তীরের এত ভেতরে? শুকনোয় কখনও

জাহাজ চলেছে বলে শুনিনি। তার মানে কি? আবার সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা আসতে শুরু করল মনে। আমি বোধহয় মরে গেছি। পরলোকে তো যা খুশি ঘটতে পারে, এই যেমন, জাহাজ হয়তো চলে শুকনো দিয়ে। যমদূতের অপেক্ষায় চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম।

খানিক পরে কিছুই ঘটল না দেখে আবার চোখ মেললাম। দূর, কি সব বাজে কথা ভাবছি!—ধমক লাগালাম নিজেকে। কোথায় এসেছি, ভাল করে দেখিই না কেন। ওপর দিকে তাকালাম। ছাতে একটা গর্ত। বুঝলাম, ওই গর্ত দিয়েই পড়েছি। সাহস ফিরে এল মনে, কিন্তু পরক্ষণেই একটা জিনিস দেখে আত্মা চমকে গেল আমার।

একজন মানুষ! না না, মানুষের কংকাল। পুরানো আমলের নাবিকের পোশাক পরনে, পচে বিবর্ণ হয়ে গেছে কাপড়ের রঙ। একটা ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে বিকট ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে রেখেছে যেন মাংস-চামড়া শূন্য মুণ্ডুটা, কালো চক্ষুকোটর দুটো যেন আমার দিকে চেয়েই শাসাচ্ছে।

নিজেকে বোঝালাম, ওটা সাধারণ একটা কঙ্কাল মাত্র, ওটাকে এতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সাহস সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালাম, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম কাছে। কয়েকটা জিনিস পড়ে আছে টেবিলে, কোনটাই ছুঁলাম না, শুধু··· নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ? দাঁড়াও, খুলেই বলি সব। বিশাল এক মোমবাতি দাঁড়িয়ে আছে রূপোর মোমদানিতে, তিন-চারশো বছর আগের জিনিস বলে মনে হলো। ওটার পাশে পড়ে আছে একটা পিস্তল, পুরানো আমলের। মিউজিয়মে দেখতে পাবে ওই জিনিস। এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে, পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে গেছে, তার পাশে পালকের কলম। মৃত্যুর আগে বোধহয় ওই কাগজে কিছু লিখছিল লোকটা, কাগজটা দিলাম এই চিঠির সঙ্গে। আরেকটা যে জিনিস দিলাম, সেটাও ছিল টেবিলে। প্রথমে মনে হয়েছিল, একটা মেডাল। হাতে নিয়ে ভাল মত দেখতেই বুঝে গেলাম, সোনার মোহর, স্প্যানিশ ডাবলূন। মিউজিয়মে দেখেছি এর আগে, তাই চিনতে পারলাম। মোহরটা রেখে দিলাম পকেটে। তারপর মন দিয়ে দেখলাম হলদে কাগজের লেখা। একটা নকশা। মাথামুণ্ডু বুঝলাম না কিছু। আরও অনেক সোনার মোহর কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো লোকটা? পরে ভালমত দেখব ভেবে, নকশাটা যত্ন করে রেখে দিলাম পকেটে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম, আর কি কি আছে জাহাজে।

পুরানো, জীর্ণ জাহাজটাতে আরও কি কি ছিল, বলার সময় এখন নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, দেখলে হাঁ হয়ে যাবে, যেমন আমি হয়েছি। কি নেই জাহাজটায়? আলমারি আর সিন্দুক ভর্তি রয়েছে কাপড়ের স্তূপ, সে-কালের নানারকম মূল্যবান কাপড়, সিল্ক, সার্টিন, ইত্যাদি। এসবও হয়তো লুকিয়ে ফেলত, হয়তো লুকানোর জন্যেই এই দ্বীপে এসেছিল

লোকটা, কিন্তু সময় পায়নি, তার আগেই মারা গেছে।

অনেক কিছুই দেখেছি, ভাবলাম, এবার বেরোনো দরকার। কিন্তু বেরোতে গিয়ে দেখলাম, যেখান দিয়ে পড়েছি, সেখান দিয়ে বেরোনো সম্ভব নয় কিছুতেই। আবার ভয় পেয়ে গেলাম। তবে কি এই অদ্ভুত জাহাজে ওই কংকালটার সঙ্গেই জ্যান্ত কবর হয়ে গেল আমার? না না, এভাবে মরতে চাই না আমি। বেরোনোর আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম। আর কোন উপায় না দেখে ভাঁড়ার থেকে একটা শাবল এনে খুঁচিয়ে ছিদ্র করলাম জাহাজের খোল। হেসো না, হেসো না—জাহাজের কাঠ দীর্ঘদিন স্যাঁতসেঁতে মাটিতে থাকতে থাকতে পচে গিয়েছে, তাই এত নরম। বড় একটা ফোকর করে, লতার দঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম আশপাশটা, আবার এলে যেন চিনতে পারি। এলে তুমিও চিনতে পারবে, হলুদ কাগজটায় চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দিয়েছি।

আগে কোন সময় নিশ্চয় একটা সরু খাল ছিল ওখানে, সাগর থেকে শ'খানেক গজ ভেতরে একটা খাঁড়িতে, গিয়ে পড়েছিল। ওই খাল বেয়ে জাহাজটা গিয়ে পড়েছিল খাঁড়িতে, তবে সেটা অনেক আগে, এখন হলে পারত না। এখন একেবারে খটখটে শুকনো। বাইরে থেকে দেখতে পাবে না জাহাজটা, পাহাড়ে ঘিরে রেখেছে, তার ওপর ঘন হয়ে জন্মেছে লতাপাতা। এতোবড় একটা জাহাজকে যেন বেমালুম গিলে নিয়েছে, কেউ ভাবতেই পারবে না আছে ওটা ভেতরে। ঠিক করলাম, যা-ই পাওয়া যায়, আমি আর কিম ভাগ করে নেব। যেদিক দিয়ে বেরিয়েছি, সে পথটা আবার লতাপাতা আর নারকেলের ডাল দিয়ে বন্ধ করে দিলাম এমনভাবে, যেন বোঝা না যায় কিছু। অনেক সময় পেরিয়েছে, এতক্ষণে হয়তো শান্ত হয়েছে হ্যামার, ভেবে ফিরে এলাম ল্যাগুনের ধারে, যেখানে আস্তানা গেড়েছি আমরা। বলতে ভুলে গেছি, একটা ছোট সুন্দর ল্যাগুন আছে দ্বীপের এক ধারে। পাহাড়ের গা থেকে ওখানে উঁচু একটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে ছাতের মত হয়ে আছে, তার নিচেই আমাদের বাসা।

চুপচাপ বসে আছে হ্যামার। আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। সাবধান করে দিয়ে বলল, ভবিষ্যতে পানি আনতে ভুল করলে আর ছাড়বে না, খুন করে ফেলবে। বললাম, আর কখনও এমন ভুল হবে না। ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমার পকেটে একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটো দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল মোহরটা, হ্যামারের একেবারে চোখের সামনে।

বালিতে পড়ে থাকা চকচকে জিনিসটার দিকে চেয়ে রইল হ্যামার দীর্ঘ এক মুহূর্ত, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন ওর চোখ। 'কোথায় পেয়েছ ওটা?'

'বলব কেন?' মুখ ফসকে বলে ফেললাম।

ধ্বক করে জ্বলে উঠল হ্যামারের চোখ, কিন্তু সামলে নিল। একেবারে বদলে গেল তার চেহারা, কণ্ঠস্বর। গলায় মধু ঢেলে বলল, 'ভাই আমার, দোস্ত আমার; তুমি না আমার প্রাণের বন্ধু! একই জাহাজে চাকরি করেছি আমরা, সমস্ত বিপদ ভাগ করে নিয়েছি, আমার জিনিস তোমার, তোমার জিনিস আমার। তাই না? সকালের কথা ভুলে যাও, মাথার ঠিক ছিল না, কি করতে কি করে ফেলেছি। তা ভাই, কোথায় পেয়েছ এটা?'

'না, মিস্টার হ্যামার,' মাথা নাড়লাম, 'মিষ্টি কথায় ভুলছি না। তোমার সঙ্গে আমার দোস্তি নেই, কোনদিন ছিল না। কিছুতেই বলছি না আমি।'

'বলবি না!' চেঁচিয়ে উঠল হ্যামার। 'হারামজাদা!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাতে ছুরি।

এক লাফে আমাদের মাঝে এসে পড়ল কিম, ঠেকাতে। ততক্ষণে ছুরি চালিয়েছে হ্যামার, সেটা আমার গায়ে না লেগে লাগল কিমের গলায়। আমি আর হ্যামার যখন কথা বলছিলাম, মোহরটা তুলে নিয়ে দেখছিল কিম, সেটা হাতেই রয়েছে। জবাই করা ছাগল যেন, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে, শিথিল হাত থেকে খসে পড়ল সোনার মোহর, ওটার পাশেই গড়িয়ে পড়ল বেচারা। রক্তে ভিজে যাচ্ছে শাদা বালি। কয়েক মুহূর্ত হাত-পা নাচিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

বোকা বনে গেলাম। হ্যামারের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, ফেকাসে হয়ে গেছে চেহারা। ছোঁ মেরে মাটি থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'খুন করেছিস ওকে তুই, গরিলার বাচ্চা গরিলা! পার পাবি না। জাহাজে উঠেই ক্যাপ্টেনকে বলে দেব।'

ঝট করে মুখ তুলল হ্যামার, ছুরিটা আবার শক্ত হাতে চেপে ধরে ছুটে এল আমার দিকে। গাল দিয়ে উঠল। আমার মরহুম ক্যাপ্টেন বলতেনঃ গাল দিতে পারে সবাই, কিন্তু ভয় পাওয়াতে পারে ক'জন? তার জন্যে তেমন বিষাক্ত জিভ থাকা চাই। এই মুহূর্তে আমার সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল, হ্যামারের মত বিষাক্ত জিভ ক'জনের আছে। একটা খুন করেছে, এরপর আর হাত কাঁপবে না তার, এক সেকেণ্ডও দেরি করলাম না। ঘুরেই দৌড় দিলাম সোজা বনের দিকে। দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম বনে, এরপর যতদিন ওই দ্বীপে ছিলাম, বন থেকে বেরোইনি। মাঝে মাঝেই দেখেছি, আমাকে খুঁজছে হ্যামার, সোনার মোহর কোথায় পেয়েছি, সেই জায়গা খুঁজছে। কোনটাই পায়নি। অবশেষে একদিন একটা জাহাজের দেখা পেলাম, আমিই প্রথম দেখেছি, ওটার দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারলাম। দ্বীপে ভিড়ল জাহাজটা। একটা স্কুনার, নাম আটলান্টিক সিটি। সৈকতে ছুটে গেলাম, হ্যামার এল পরে, দ্বীপের উল্টো

প্রান্তে ছিল, হাঁকডাক শুনে ছুটে এসেছে। না, হ্যামারের কুকাণ্ডের কথা বলিনি ক্যাপ্টেনকে। আর বলবই বা কখন। আমরা জাহাজে ওঠার পর থেকেই একটা না একটা অঘটন ঘটেই চলল। প্রথমেই রাডার খারাপ হয়ে গেল, তারপর মাস্তুল ভেঙে পড়ে মারা গেল দু'জন লোক। আরও কত কাণ্ড যে ঘটল। যা-ই হোক, অবশেষে যেন ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন এসে বোসটনে ভিড়ল আটলান্টিক সিটি। বন্দর থেকে বেরিয়েই পড়লাম গাড়ির তলায়। জ্ঞান ফিরতেই দেখি শুয়ে আছি হাসপাতালের বেডে। এখানে বসেই এই চিঠি লিখছি। সারাক্ষণ হ্যামারের ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। জাহাজে থাকতেই শাসিয়েছে, সোনার সন্ধান না দিলে আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে।

শরীর খারাপ, ভাবছি, ভাল হলেই তোমাকে দেখতে আসব। চাকরিও দরকার। সী-ওয়েড তো গেছে, আরেকটা ভাল জাহাজ আর ভাল ক্যাপ্টেন খুঁজে নেয়া যে কী কঠিন। যদি কোন কারণে আমি আসতে না পারি এ-চিঠি আমার একজন নতুন নাবিক-বন্ধুকে দিয়ে দেব, সে পৌঁছে দেবে তোমার কাছে।

যদি আমার কিছু ঘটে যায়, তুমি যেও সেই দ্বীপে, যখন পারো। প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে ওখানে, আমার বিশ্বাস। আর যদি মোহর খুঁজে না-ই পাও, জাহাজে যা সম্পদ আছে, সেগুলো এনে বিক্রি করলেও বড়লোক হয়ে যাবে। প্রথমে প্রভিডেন্সে যাবে, সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল গেলেই পেয়ে যাবে দ্বীপটা। দেখলেই চিনবে, সপ্তমী চাঁদের আকৃতি, পুবধারে পাহাড়। জাহাজটা পাবে উত্তর প্রান্তে, ওদিকে আরেকটা খুদে দ্বীপ প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে মূল দ্বীপের। ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিলাম।

এ-মুহূর্তে তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে, বব। প্রথম সুযোগেই তোমাকে দেখতে আসব। আবার বলছি, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, বড় হয়ে তুমি কিন্তু যেও সেই দ্বীপে, যেভাবে পারো।

ভাল থেকো, বব, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই জানাই।

ইতি—
তোমার বাবা।

পাঁচ

চিঠি পড়া শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। এমনকি মুসা আমান পর্যন্ত চুপ করে আছে। ববের চোখে জল, নীরবে কাঁদছে সে, গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে অশ্রুধারা।

চিঠিটা আবার ভাঁজ করে রাখছে কিশোর, শুধু তার মৃদু খসখস শব্দ, এছাড়া একেবারে নীরব হেডকোয়ার্টার। চিঠি ভাঁজ করে রেখে খামের ভেতর হাত ঢুকিয়ে

আরেকটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ বের করে আনল সে, হলদেটে কাগজ। মেলল। 'হ্যাঁ, এই যে সেই নকশা,' নীরবতা ভাঙল সে।

'বোঝা গেল...,' চোখ মুছতে মুছতে বলল বব, কেন চিঠিটা নিতে এসেছিল গরিলা হারামজাদা।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

'সোনার মোহরটার জন্যে,' বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। এসেছিল চিঠিটার জন্যে, পড়ে দেখতে চেয়েছিল, কি লেখা আছে। গুপ্তধন কোথায় আছে, লেখা আছে কি-না।'

'গিয়ে তাহলে খুঁজে বের করে নেবে,' বলল বব।

'পারুক না পারুক, চেষ্টা তো অবশ্যই করবে।'

একটু চুপ করে থেকে বব বলল, 'তো, কি মনে হয় তোমার? বাবা কি সত্যিই গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিল?'

'আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমার বাবাকে তুমি চেনো, তুমি ভাল বলতে পারবে তিনি কেমন লোক ছিলেন। চিঠি পড়ে আমার যা মনে হলো, মিথ্যে বলার লোক তিনি নন। একটা বর্ণও মিথ্যে লেখেননি।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল বব। 'ফালতু কথা বলত না কখনও বাবা।'

'আমারও তাই ধারণা। আর সত্যি যে তিনি বলছেন, এই নকশা আর মোহরটাই তার প্রমাণ।'

'সবই তো জানলাম,' মুসা বলল, 'এখন আমরা কি করব?'

'কিছু তো একটা করবই,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'বব, আমার মনে হয়, জলদস্যুর জাহাজ আবিষ্কার করে বসেছেন তোমার বাবা। এক সময় ওসব সাগরে জলদস্যুদের আনাগোনা ছিল খুব বেশি। কাছাকাছি কোন ব্যাংক ছিল না, আর থাকলেও তাতে মোহর রাখতে যেত না ডাকাতেরা। অসৎপথে অর্জিত টাকা রাখতে যাবেই বা কোন সাহসে? নিয়ে গিয়ে তাই লুকিয়ে রাখত কোথাও, নির্জন জায়গায়ই বেশি রাখত। আর কোনদিনই হয়তো গিয়ে ওই ধন তুলে আনার সুযোগ হত না অনেকের। কিন্তু এটা অন্য কেস। কোনভাবে জাহাজটা ঢুকে গিয়েছিল খাঁড়িতে, আটকে গিয়েছিল, যে লোকটা ওতে ছিল, বেরোতে পারেনি আর। যেভাবেই হোক, মারা গেছে সে। বছরের পর বছর পড়ে থেকে পচেছে জাহাজটা, শেওলা আর লতাপাতা আগাছায় ছেয়ে ফেলেছে এক সময়। জানোই তো, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় জঙ্গল কি হারে বাড়ে। আর বাইরে থেকে দেখা যায় না কেন, দেখাচ্ছি,' উঠে গিয়ে ছোট বুকশেলফ থেকে মোটা একটা এনসাইক্লোপিডিয়া বের করে আনল কিশোর, খুলে একটা ছবি বের করল। ববের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই হলো জাহাজের চেহারা, আজকের লোহার জাহাজ তো না। পাহাড়ের ভেতরে লতাপাতায় ঢাকা থাকলে বের করা খুব মুশকিল। এই জন্যেই হ্যামার এত খুঁজেও পায়নি। তোমার বাবা হঠাৎ করেই তার ভেতরে পড়ে গিয়েছিলেন, নইলে তিনিও কোনদিনই দেখতে পেতেন না জাহাজটা। কিন্তু হ্যামার ব্যাটা সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

'কি করে এত শিওর হচ্ছ, হ্যামারই গিয়েছিল আমার ঘরে?'

'খুব সহজ ব্যাপার। তোমার বাবা তো খুব ভালমতই বর্ণনা দিয়েছেন তার চেহারার। বার বার উল্লেখ করেছেন গরিলা বলে, তোমার ঘরে যে এসেছিল, সে দেখতে গরিলার মত নয়? গালে কাস্তের মত বাঁকা কাটা দাগ ছিল না? চেহারা না হয় দু'জনের মানুষের প্রায় একরকম হতে পারে, কিন্তু কাটা দাগ?'

আবার খানিকক্ষণ নীরবতা।

'তোমার কি মনে হয়?' বলল বব। 'হ্যামারই বাবাকে খুন করেছে?'

'মনে হওয়া খুব সঙ্গত। কথায় কথায় ছুরি বের করে সে, কিমকে খুন করেছে, তোমার বাবাকেও খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছে বার বার। আর গুপ্তধনের জন্যে মানুষ খুন, এটা নতুন কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। চিঠি নিয়ে এসেছিল যে নাবিক, সে বলেছে, সরাইখানায় নাকি পিঠে ছুরি বেঁধা অবস্থায় দেখেছে বাবাকে...,' কথা রুদ্ধ হয়ে এল আবার ববের।

'হ্যামার নিশ্চয় অনুমান করেছে,' হাতের তালু নাড়ল কিশোর, 'তোমার চিঠিতে নকশা-টকশা কিছু একটা এঁকে পাঠাবেন তোমার বাবা। প্রথমে গিয়েছিল তোমার বাবার ঘরে, সরাইখানায়, কিন্তু তার আগেই ওগুলো হাতবদল করে ফেলেছেন তিনি। রাগের মাথায় তাঁকে খুন করেছে। তারপর এসেছে তোমার কাছে,' কি মনে হতেই তাড়াতাড়ি আবার চিঠি খুলল কিশোর। দেখে নিয়ে বলল, 'চিঠিটা কবে নিয়ে এসেছে বলেছিলে তখন?'

'আজ বিকেলে।'

'হুঁ। আরও অনেক আগেই আসার কথা ছিল। অনেক দেরি করে এনেছে নাবিক। এই যে তারিখ,' দেখাল কিশোর, 'তিন মাস আগের। এত দেরি করল কেন?'

'শুনেছি,' সঙ্গে সঙ্গেই বলল বব, 'কেন এত দেরি হয়েছে। তিন মাস আগেই নাকি চিঠি দিয়েছিল তাকে বাবা, কিন্তু আসতে দেরি হয়ে গেছে তার নানা কারণে। চিঠিটা সে হাতে নেয়ার পর থেকে নাকি একের পর এক অঘটন ঘটেছে। নানারকম ঝামেলায় জাহাজে চড়তেই দেরি হয়ে গেছে নাবিকের, তারপর যখন রওনা হলো শুরু হলো, দুর্ঘটনা। ঝড়ে পড়ল জাহাজ, প্রপেলারের ব্লেড গেল ভেঙে, এক বন্দর থেকে সেটা সারিয়ে নিয়ে আবার ছাড়ল জাহাজ। কয়েক মাইলও যায়নি, কুয়াশার মধ্যে নাকি একটা ট্রলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগাল। ডুবতে ডুবতে কোনমত বন্দরে ফিরে গেল আবার মেরামত করাতে।'

মোলায়েম শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'পুরো ব্যাপারটাই জানি কেমন গোলমেলে, খালি প্যাঁচ আর প্যাঁচ।' মুসার দিকে তাকিয়ে নিল একবার কিশোর, কি জানি হয়েছে আজ গোয়েন্দাসহকারীর, কথা বলাই যেন ভুলে গেছে। বড় বেশি চুপচাপ। ববের দিকে ফিরল আবার গোয়েন্দাপ্রধান। 'চিঠি তো পেলে, জানলেও সব কিছু। কি করবে, ঠিক করেছ?'

'পুলিশের কাছে যাওয়াই তো উচিত।'

'কি বলবে?'

'বলব, বিগ হ্যামার আমার বাবাকে খুন করেছে।'

'কি প্রমাণ আছে তোমার হাতে?'

'অ্যাঁ!...তাই তো!...কি করব তাহলে?'

কিছুক্ষণ সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল, তারপর ববের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যামারের কাছ থেকে দূরে থাকবে। গুপ্তধনের খোঁজে রয়েছে, কাজেই মরিয়া এখন সে। কয়েকটা প্রশ্ন খোঁচাচ্ছে আমাকে। ও তোমার কথা জানল কি করে? তোমার বাবার কাছে শুনেছে? কি করে জানল, তোমাকে চিঠি দিয়েছে তোমার বাবা, তাতে গোপন কথা লেখা আছে?' টেবিলে কনুই রেখে দু'হাতের আঙুলের মাথা এক করছে, আবার সরিয়ে আনছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'এবার দেখা যাক, কি কি জেনেছি আমরা। এক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন নির্জন দ্বীপে পুরানো একটা জাহাজ লুকিয়ে আছে, যাতে রয়েছে মূল্যবান বস্তু, ওটার আশেপাশেই হয়তো রয়েছে গুপ্তধন। দুই, ব্যাপারটা আমরা যেমন জানি, বিগ হ্যামারও জানে, গুপ্তধন পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তিন, তোমার কাছে একটা চিঠি আছে, তাতে গুপ্তধনের ঠিকানা লেখা আছে...কোনভাবে এটা জেনেছে হ্যামার। সুতরাং, তোমার এখন উচিত কোথাও লুকিয়ে থাকা। ডকের ধারে ওই চিলেকোঠার ছায়া মাড়ানো ঠিক হবে না। মারা পড়বে।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল বব। 'কি করব তাহলে?' আবার একই প্রশ্ন। ফাটা বাঁশে লেজ আটকেছে, করি কি এখন! চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলি? হ্যামার ধরলে বলব, পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'বিশ্বাস করবে?' ভুরু নাচাল মুসা।

অসহায় ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিল বব, টান টান করে দিয়ে এক পায়ের ওপর আরেক পা রাখল। 'না, তা করবে না। মিছে কথা বলছি ভেবে পিটিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে। কি করব?'

'গুপ্তধন খুঁজে আনার কথা বলছ না কেন একবারও?' কিশোর বলল।

'চাঁদ পেড়ে আনব বললেই কি আর পাড়া যায়?' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বব। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন! পকেটে নাই কানাকড়ি, খরচ পাব কোথায়?'

মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'সেকেণ্ড, তোমার কি মনে হয়? ওকে সাহায্য করতে পারব আমরা?'

তালুতে তালু ডলল মুসা, ঠাণ্ডা হাত ডলে গরম করছে যেন। 'আমরা!... কিছু একটা ভাবছ তুমি কিশোর, বলে ফেলো না।'

'গুপ্তধন শিকারে যদি যাই আমরা?'

ফেকাসে হয়ে গেল মুসার চেহারা পলকের জন্যে। 'খাইছে!' তোতলাতে শুরু করল, 'কি-কি-কিভাবে...'

হাসল কিশোর। 'সহজ হবে না যাওয়া। তবে ইচ্ছে করলে যেতে পারি আমরা। তার জন্যে প্রথমেই দরকার, টাকা। অনেক টাকা।'

'কোথায় পাব এত টাকা?'

'চেষ্টা করলে পাব,' ববের দিকে ফিরল কিশোর। 'বব। একটা প্রস্তাব রাখছি। ধরো, টাকা আমি জোগাড় করতে পারলাম, যাওয়াও হলো, ডাবলুনগুলো পেলামও আমরা, ভাগাভাগিটা কিভাবে হবে? তোমার অর্ধেক আমাদের অর্ধেক? খরচাপাতি গিয়ে যা থাকবে সেটাই ভাগ হবে। রাজি?'

'আমাকে নিয়ে তামাশা করছ?' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল বব, শার্টের একটা ছেঁড়া জায়গা ডলে সমান করার চেষ্টা করল।

'ছি, কি বলছ! তামাশা করব কেন? সত্যিই বলছি।'

'তোমার যা ইচ্ছে করো, সব কিছুতেই আমি রাজি,' অনুনয় ঝরল ববের কণ্ঠে। 'শুধু এই বিপদ থেকে বাঁচাও। হ্যামারের ছুরি খেয়ে মরতে চাই না আমি।'

'তাহলে অর্ধেক ভাগে তুমি রাজি,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর। 'তো কাজ শুরু করে দেয়া যায়। এখন প্রথম কাজ, দ্বীপটার অবস্থান জানা...'

'চিঠিতেই তো লেখা আছে...' বাধা দিয়ে বলল মুসা।

'লেখা দিয়ে দ্বীপ খুঁজে পাওয়া যায় না, ম্যাপ দরকার,' হাত তুলল কিশোর।

'এত খুদে দ্বীপ ম্যাপে থাকবে?'

'থাকবে না। কিন্তু প্রভিডেন্স দ্বীপটা থাকা উচিত, নামধাম আছে যখন, বোঝা যাচ্ছে, নাবিকেরা চেনে ওটা। আশেপাশে নিশ্চয় আরও দ্বীপ আছে। এমনিতেই ক্যারিবিয়ানে দ্বীপ বেশি। ছোট, বড়, মাঝারি সব রকমের আছে।'

'হলদে কাগজটায় ঠিকানা লেখা নেই? পথ নির্দেশ?'

'না, দেখেছি ভালমত। দ্বীপে নামার পর হয়তো কাজে লাগবে ওটা,' বলল কিশোর, 'অর্থ বের করতে পারি যদি। দেখে তো মনে হচ্ছে, একটা গোলকধাঁধা। মানে না বুঝলে এটা হাতে থাকা না থাকা সমান কথা। আর নকশা ছাড়া গুপ্তধন পাওয়ার আশা প্রায় শূন্য। প্রশান্ত মহাসাগরে কোকোস দ্বীপের নাম শুনেছ? ওখানে গুপ্তধন আছে, ইতিহাস তাই বলে। কথাটা জানাজানি হতেই দলে দলে লোক ছুটল। দ্বীপটা বেশি বড় না, অথচ এত লোকে খুঁজেও একটা মোহর বের করতে পারল না। এক জার্মান থেকেই গেল ওখানে, চষে ফেলল দ্বীপটা। গর্ত যা খুঁড়েছে, মস্ত একটা লড়াইয়ের মাঠেও এত ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয় কিনা সন্দেহ। আঠারো বছর থেকেছে লোকটা, হাতে ফোসকা ফেলেছে শুধু, ম্যালেরিয়া বাধিয়েছে, কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। কাজেই বোঝো।'

'দিচ্ছ তো হতাশ করে!' হাত নাড়ল মুসা।

'পাবই, এই গ্যারান্টি কে দিল তোমাকে?'

'তাহলে যেতে চাইছ কেন?'

'আশা আছে বলে। ফিফটি ফিফটি চান্স ধরে নেয়াই ভাল। যাকগে, এখন ম্যাপ দেখা দরকার। প্লেন আর পাইলট জোগাড় করতে হবে।'

'কি বললে? প্লেন!' বিস্ময়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ববের।

'হ্যাঁ। কেন, জাহাজে যাব ভাবছিলে নাকি?'

'জাহাজেই তো সুবিধা, নাকি?'

'না, অসুবিধা। নানারকম ঝামেলায় পড়তে হবে। তার চেয়ে প্লেনে যাওয়া

নিরাপদ, সময়ও কম লাগবে, খরচ অবশ্য বেড়ে যাবে অনেক। কিন্তু খরচের কথা মোটেই ভাবছি না।'

এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে কিশোর, বুঝতে পারছে না মুসা, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেসও করল না। কিশোর পাশা যখন বলছে পারবে, নিশ্চয় পারবে।

'টাকা খরচ করলে ভাল প্লেন হয়তো পাওয়া যাবে,' ঘাড় চুলকালো কিশোর, 'কিন্তু ভাল পাইলট পাওয়াই মুশকিল, তাছাড়া বিশ্বস্ত পাইলট। থাক, ওসব নিয়ে পরে ভাবব। আগে ম্যাপে দেখা দরকার, কোথায় যাচ্ছি আমরা।'

'মেরিচাচী রাজি হবেন?' না বলে পারল না মুসা।

'সব চেয়ে কঠিন কাজ ওটাই,' স্বীকার করল কিশোর, 'চাচীকে রাজি করানো,' উঠে দাঁড়াল সে। 'ওঠো, আমার ঘরে যাই। ম্যাপ ওখানে।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে অঝোর বর্ষণ। এরকম জরুরী অবস্থার জন্যেই ওয়ার্কশপে দুটো ছাতা রেখে দিয়েছে কিশোর, কাজে লাগল এখন।

নিজের ঘরে এসে ম্যাপ বের করল কিশোর, টেবিলে এনে রাখল। মুসা আর ববের উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ারে বসল সে। ম্যাপ খুলে গভীর মনোযোগে দেখল কিছুক্ষণ, আঙুল রাখল এক জায়গায়, 'এই যে, প্রভিডেন্স।' পেন্সিল দিয়ে হালকা গোল একটা দাগ দিল দ্বীপটাকে ঘিরে। 'এখানে নামতে পারেনি ওরা,' পেন্সিল এগিয়ে নিয়ে চলল সে দক্ষিণ-পশ্চিমে, আঁকাবাঁকা একটা দাগ পড়ল ম্যাপে, 'স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এদিকে, এই যে এই দ্বীপপুঞ্জগুলোর কোন একটাতে।' ছোট ছোট কয়েকটা বিন্দুকে ঘিরে আবার গোল দাগ টানল সে। 'দেখেছ, কত ছোট? কোন কোনটা হয়তো দ্বীপই নয়, নিছক বালির চর, ঝকঝকে শাদা বালি, গাছ নেই, পানি নেই, সামুদ্রিক পাখি আর কচ্ছপ ডিম পাড়ে এসব জায়গায়, মানুষ বাসের অযোগ্য। এখানে, কোন কোনটা আবার বেশ বড়, বিশ-তিরিশ মাইল লম্বা। এসব দ্বীপের কোনটাতেই ঘাঁটি করতে পারব না আমরা। রসদ, বিশেষ করে প্লেনের তেল এর কোনটাতেই পাওয়া যাবে না আমার বিশ্বাস। কিংসটন আর জ্যামাইকা এখান থেকে অনেক দূরে, পোর্ট অভ স্পেনও। তাহলে?, মূল ভূখণ্ডের কোন শহর থেকেই গিয়ে ওসব আনতে হবে আমাদের, প্লেনের জন্যে কয়েকশো মাইল অবশ্য কিছু না। কোন শহরটা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'ম্যারাবিনা?' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল মুসা।

'আমিও তাই ভাবছি,' কিশোর মাথা ঝোঁকাল। 'এটাই সব চেয়ে কাছে হবে।'

'কোথায় ওটা?' জিজ্ঞেস করল বব। 'নাম শুনিনি।'

'সেন্ট্রাল আমেরিকায়। এক বিচিত্র শহর,' বলল কিশোর। 'কোস্টারিকা আর হন্দুরাসের মাঝে যেন আটকে রয়েছে, যেন বিশাল স্যাণ্ডউইচের মাঝে মাংসের বড়া,' ধাপাস করে ম্যাপ-বইটা বন্ধ করল সে। 'দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার সময় প্যান-অ্যামেরিকান এয়ার রুটেই পড়ে। আইনকানুনের বালাই নেই, যার যেভাবে খুশি চলছে, ক্ষমতায় আসীন কর্তা ব্যক্তিরা লুটে পুটে খাচ্ছে সব। থাকগে, আমাদের কি? আমাদের পেট্রোল পেলেই হলো। মনে হয়, ওটা ম্যারিন এয়ারপোর্ট, যদি তাই

হয় তাহলে ম্যারিন এয়ারক্র্যাফট দরকার।'

'সী-প্লেন?' ভুরু নাচাল মুসা।

'ফ্লাইং-বোট, উভচর হলে সব চাইতে ভাল হবে, জলে-ডাঙায় যেখানে খুশি নামতে পারব। দামী খুব ভাল কোন প্লেন দরকার নেই, আটলান্টিক পাড়ি দিতে যাচ্ছি না, কাজ চলার মত হলেই হলো।' থামল একটু সে, একে একে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল। 'তো, আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করে দিতে পারি আমরা?'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই দরজা খুলে উঁকি দিলেন মেরিচাচী, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'এই কিশোর, কতবার না বলেছি, ম্যাটে জুতো মুছে যাবি? কি করেছিস, দেখ্‌তো? এসবের কোনও মানে আছে?'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'কি বলছ, চাচী, মুছেই তো ঢুকেছি!'

'মুছে ঢুকেছিস!' বিস্ময় ফুটল মেরিচাচীর কণ্ঠে, জানেন, কিশোর মিথ্যে কথা বলে না। 'কে করল···চোর-টোর না-তো!'

চোখের পাতা কাছাকাছি হলো কিশোরের. উঠে দাঁড়াল। দরজায় এসে দেখল, ম্যাটটার ওপাশে বেশ কয়েকটা ছাপ, পানি আর কাদা লেগে আছে, বড় বড় জুতো-পায়ে একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে কেউ। 'এখনো বৃষ্টি পড়ছে, না?'

'পড়ছে মানে? মুষলধারে,' বললেন চাচী।

'আশ্চর্য!' গাল চুলকাল কিশোর। 'ঠিক আছে, চাচী, তুমি যাও। আমি মুছে ফেলব। চোর-টোরই হবে!'

'হুঁ!' এদিক-ওদিক তাকালেন মেরিচাচী। 'কিছু নিয়ে যায়নি তো···।' ফিরলেন আবার কিশোরের দিকে। 'খাবি না? রাত তো অনেক হলো।'

'না। খেয়ে এসেছি,' বলল কিশোর। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু খাবে?'

'না,' লজ্জিত হাসি হাসল মুসা। 'তখন অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি।'

'বব, তুমি?'

'না,' মাথা নাড়ল বব।

'কিছুই খাবি না?' আবার বললেন মেরিচাচী।

'নাহ্। আর তেমন খিদে পেলে ফ্রিজ থেকে নিয়ে খেতে পারব,' কিশোর বলল।

'ঠিক আছে। রাত বেশি করিস না, শুয়ে পড়,' বলে চলে গেলেন তিনি।

মেরিচাচী চলে যেতেই কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। 'কি মনে হয়? কার কাজ?'

'এখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল!' বিড়বিড় করল গোয়েন্দাপ্রধান, 'বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ভেতরে আলোচনা চললে বাইরে আড়ি পেতে কেন দাঁড়িয়ে থাকে লোকে?'

'কি আলোচনা হচ্ছে শোনার জন্যে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বব।

'ঠিক,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'কিন্তু অয়েলস্কিন পরে কে আসতে পারে? সাধারণ কেউ হলে উলের ওভারকোট পরে আসত। উল পানি শুষে নেয়, কিন্তু যে

হারে পড়ে মেঝে ভিজেছে, ওভারকোট হতে পারে না। অয়েলস্কিন। কারা অয়েলস্কিন পরে? পুলিশ আর পোস্টম্যান। তাদের কেউই লোকের বাড়িতে উঁকি মারবে না, এভাবে আড়ি পেতে কথা শোনার চেষ্টা করবে না। তাহলে কে?'

'নাবিক!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'বাহ্, বুদ্ধি খুলছে তোমার,' মৃদু হাসল কিশোর।

লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল বব। 'মানে? হ্যামার অনুসরণ করে এসেছে, এখানেও!'

আলমারি খুলে নিচের তাক থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করল কিশোর, মোছার জন্যে দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল। 'সেই বোসটন থেকে আসতে পেরেছে, আর এটুকু পথ আসতে বাধা কি?'

ছয়

প্লেনের জানালা দিয়ে পাঁচ হাজার ফুট নিচের তরঙ্গায়িত উজ্জ্বল নীল সাগরের দিকে তাকাল কিশোর। দূরে পাথুরে তীরে ঢেউ ভাঙছে, নীলচে-মাখন ফেনার একটা আঁকাবাঁকা রেখা এগিয়ে গেছে মাইলের পর মাইল, মোড় নিয়ে হারিয়ে গেছে ঘন বেগুনী রঙের আড়ালে। রেখাটার ডানে জঙ্গল, মস্ত এক সবুজ চাদর যেন বিছিয়ে দিয়েছে কেউ।

কিশোরের পাশে পাইলটের সীট, পেছনের দুটো সীটে বব আর মুসা। একঘেয়ে উড়ে চলা আর ভাল লাগছে না ওদের, হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

সেই যেদিন প্রথম ববের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিশোর আর মুসার, তারপর পুরো একটি মাস কেটে গেছে। অনেক কাজ, সব কিছু গোছগাছ করতে সময় লেগেছে দুই গোয়েন্দার। তিন গোয়েন্দার একজন, রবিন মিলফোর্ড, এই অভিযানে ওদের সঙ্গে আসতে পারেনি, তার নানীর শরীর নাকি খুব খারাপ, বাঁচেন কি মরেন ঠিক নেই, তাকে দেখতে চেয়েছেন, বাধ্য হয়েই মা-বাবার সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে যেতে হয়েছে রবিনকে।

খরচের টাকা জোগাড় করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি কিশোরের, জিনাকে বলতেই সে টাকা ধার দিতে রাজি হয়েছে। জিনার এখন অনেক টাকা, দ্বীপে সোনার বার যা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো বিক্রি করা টাকা সব তার নামে ব্যাংকে জমা করে দিয়েছেন তার বাবা। মোহর পাওয়া গেলে, একটা ভাগ জিনাকে নিতে হবে, এই শর্তে তার কাছ থেকে টাকা নিতে রাজি হয়েছে কিশোর। জিনা ভাগ নিতে রাজি হচ্ছিল না প্রথমে, কিশোরও তাহলে টাকা নেবে না, অবশেষে হার মানতেই হয়েছে জিনাকে। সে-ও আসতে চেয়েছিল এই অভিযানে, অনেক কায়দা করে এড়িয়েছে কিশোর।

টাকা জোগাড় হয়ে যেতেই বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারকে গিয়ে ধরেছে কিশোর। অনেক ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেছেন। পাইলট তিনিই জোগাড় করে দিয়েছেন, তাঁর খুব পরিচিত লোক, বিশ্বস্ত। পাইলট এক অদ্ভুত লোক,

বাড়ি মিশরে, নাম ওমর শরীফ। লম্বা, ছিপছিপে, ক্লিন-শেভড্ যুবক, মাথায় ঘন চুল পুরোপুরি কালো নয়, কেমন একটা তামাটে ছোঁয়াচ, গায়ে বেদুইনের রক্ত, তাই বোধহয় বড় বেশি এক রোখা। আমেরিকান নেভিতে ছিল, বসেরা তার কাছ থেকে বোধহয় বিশেষ তোয়াজ পায়নি, তাই প্রমোশন দিতে চায়নি। এতে রেগে গিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট ওমর। এখন সিনেমায় স্টান্ট-ম্যানের কাজ করে। পরিচালকের নির্দেশে হাজার হাজার ফুট ওপর থেকে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেয়, বিপজ্জনক গিরিপথে বিমান নিয়ে উড়ে যায় তীব্র গতিতে, এমনি সব কাজ। খুব কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই, কিন্তু এসবে আনন্দ পায়, রোমাঞ্চ অনুভব করে বেদুইনের ছেলে ওমর।

দুই গোয়েন্দার সঙ্গে ওমরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জনাব ক্রিস্টোফার। অভিযানে যেতে রাজি আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন পাইলটকে। সব শুনে লাফিয়ে উঠেছে ওমর, এক কথায় রাজি। এমন লোককে সঙ্গী পেয়ে কিশোর আর মুসাও খুব খুশি।

ওমর শরীফই বিমানের ব্যবস্থা করেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউ ইর্য়কে এসেছে তিন কিশোরকে নিয়ে। ওখানে প্যান-আমেরিকার এয়ার ওয়েজে একটা বিমান ভাড়া নিয়েছে ওরা। পুরানো আমলের সিকোরস্কি, কিন্তু ওমরের এটাই পছন্দ। যে-রকম অভিযানে চলেছে ওরা, এই জিনিসই কাজ দেবে। চার সীটের একটা উভচর, টুইন-ইঞ্জিন, বেশ বড় লাগেজ কম্পার্টমেন্ট—অনেক মালপত্র রাখা গেছে। ঠিকই বলেছে ওমর, নতুন পাইলট-বন্ধুর ওপর ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। এত পুরানো আমলের প্লেন নিচ্ছে দেখে প্রথমে একটু নাকই সিঁটকেছিল কিশোর, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ভুল। গত চার দিন ওদেরকে নিয়ে উড়ছে প্লেনটা, সামান্যতম গোলযোগ করেনি। এয়ার-ওয়েজ কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিল কিশোর, যদি কোনরকম গোলমাল করে, কি হবে? তারা বলেছে, বিমান ঘটিত যে কোন রকম অসুবিধে দেখবে তারা, তাদের স্থানীয় অফিসে শুধু জানাতে হবে, ব্যস, এরপর যা করার ওখানকার লোকেরাই করবে। একটা কোলাপসিবল রবারের ভেলাও সরবরাহ করেছে এয়ার-ওয়েজ, ওমরের অনুরোধে। তার ধারণা, যেখানে যাচ্ছে, জিনিসটা কাজে লাগবে।

চারদিন ধরে উড়ে উড়ে ববও ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে পড়েছে, অথচ প্রথম দিকে তার আনন্দ-উত্তেজনার সীমা ছিল না, জীবনে এই প্রথম প্লেনে চড়ছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে, যখনই কোন দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, রূপালী সৈকত দেখে হা-হুতাশ করে উঠছে মন, ইস্, এই মুহূর্তে যদি ওখানে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যেত! নীল সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করা যেত! ছোট্ট এই কুঠুরিতে গুটিয়ে বসে থাকতে কত আর ভাল লাগে?

মুসাও নির্বাক। এভাবে বসে থাকতে তারও আর ভাল লাগছে না। গন্তব্যস্থল আসে না কেন? এই আদিম উভচর না হয়ে, জেট হলে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারত। কেন যে···তার ভাবনা মাঝপথেই ছিন্ন করে দিয়ে নাক ঝুঁকে গেল

বিমানের। বকের মত গলা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল মুসা, পৌঁছে গেছে ওরা। শাদা রঙ করা এক ঝাঁক বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ববের দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই হাসল মুসা।

'এসেছি?', জিজ্ঞেস করল বব।

'লাগছে তো ম্যারাবিনার মতই। যা শুনেছি, সে-রকমই লাগছে,' মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'এ-কেমন জায়গা!' নিচের দিকে চেয়ে বলল বব।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর, হেসে বলল, 'কেমন আর? পথে আরও কয়েক জায়গায় থেমেছি না, ওরকমই হবে। তবে বিষুবরেখার কাছে তো, গরম বেশি লাগবে। সভ্য-ভব্য জায়গা বলে মনে হচ্ছে না, কেমন যেন সেকেলে।'

পানি ছুঁলো উভচর। চাকার জায়গায় ছোট নৌকার মত দুটো জিনিস নীল পানি চিরে শাদা লম্বা দুটো দাগ সৃষ্টি করে ছুটল বন্দরের দিকে।

বিমান থামাল ওমর। ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল কাচের ফোল্ডিং ককপিট। হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে, প্যান-আমেরিকান নোঙর করার জায়গা বোধহয় ওটা।' পানির ধারে একটা হ্যাঙার, তাতে একটা ফ্লাইংবোট বেঁধে রাখা হয়েছে। 'নিউ ইয়র্কে ওরা বলেছিল, জরুরী অবস্থার জন্যে ডিপোতে বাড়তি বিমান রাখে। ওটার পাশেই রাখব।'

বসতে গিয়েও বসল না ওমর, ফুট ফুট আওয়াজ তুলে একটা মোটরবোট এগিয়ে আসছে এদিকেই। সরকারী ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার দাঁড়িয়ে আছে গলুইয়ের কাছে, পোশাকটা জমকালোই ছিল এককালে, কিন্তু এখন চাকচিক্য হারিয়ে মলিন হয়ে গেছে।

'আমাদেরকেই ইঙ্গিত করছে, না?' কিশোরও তাকিয়ে আছে বোটটার দিকে।

'তাই তো মনে হয়।...হ্যাঁ, আমাদের কাছেই আসছে। কাগজপত্র চেক করবে বোধহয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?'

উভচরের পাশে থামল মোটরবোট, ঢেউয়ে দুলে উঠল বিমান। নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলল সরকারী কর্মচারী, চামড়া ঈষৎ বাদামী, উদ্ধত ভাবভঙ্গি, কথার তুবড়ি ছোটাল উভচরের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে।

'নো কমপ্রেনডো,' ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ বলল ওমর।

'কি বলছে ব্যাটা?' কিশোর বলল। 'আমাদেরকে যেতে বলেছ না তো?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে নড়বড়ে জেটি দেখিয়ে, ইঙ্গিতে অফিসারের কাছে জানতে চাইল ওমর, ওদিকেই যেতে বলছে কিনা।

'সি, সি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল অফিসার।

'হ্যাঁ,' কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'ওর সঙ্গেই যেতে বলছে। আশ্চর্য! কিন্তু বলছে যখন, যেতেই হবে। কথা না শুনলে বিপদে ফেলে দেবে।...এইই হয়।' বিড়বিড় করল সে। 'দেশ যত ছোট হয়, লোকগুলো ততই বড় বড় বুলি আউড়ায়—হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা। আরে ব্যাটা, শ্বেতাঙ্গর মত ভাব দেখালেই কি আর শ্বেতাঙ্গ হয়ে গেলি? যত্তোসব।'

'শ্বেতাঙ্গ নয় ওরা?' নিচু কণ্ঠে বলল মুসা।

'চামড়া শাদা-ই,' অফিসারের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো ওমর, বসে পড়ল পাইলটের সীটে, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল আবার। 'সেন্ট্রাল আমেরিকার শহরগুলোতে কোন আইন-কানুন নেই, জোর যার মুল্লুক তার। স্প্যানিশরা ঢুকিয়েছে এই বিষ। কলোনি করেছিল এখানে, তারপর একদিন শেষ হলো তাদের দিন। কেউ মরল, কেউ চলে গেল দেশে। যারা রয়ে গেল, মিশে যেতে লাগল তাদের গোলামদের সঙ্গে, বিশেষ করে নিগ্রো গোলাম। তারা আবার মিশতে শুরু করল স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। ফলে এখন কোন্ রক্তটা যে আসল, বলা মুশকিল। এমন একটা মিশ্র জাতি দুর্নীতিবাজ হবে না-তো, কারা হবে?'

হাত তুলল কিশোর, 'ওই যে ডাকছে। চলুন।'

থ্রটল টানতেই আগে বাড়ল উভচর, বোটটাকে অনুসরণ করে চলল ওমর। জেটির লাউঞ্জে জটলা করছে কিছু দর্শক, আধডজন রাইফেলধারী পুলিশের পেছনে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।

'অবস্থা সুবিধের না,' শুকনো কণ্ঠে বলল ওমর, সুইচ টিপে থামিয়ে দিল ইঞ্জিন। দ্রুত আরেকবার তাকাল সশস্ত্র লোকগুলোর দিকে।

জেটিতে নেমে পড়েছে মুসা আর বব, খুঁটির সঙ্গে উভচরকে বাঁধছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'কেন?'

'পুলিশের ভাবভঙ্গি ভাল ঠেকছে না। সাবধান হয়ে যাও, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।' নাম কুঁচকে শুঁকছে সে, যেন সত্যি সত্যি গন্ধ আছে বাতাসে।

'এটা মরুভূমি নয়, জনাব,' হাসল কিশোর, 'যে...'

'...সে-জন্যেই তো আরও খারাপ লাগছে। পানি পছন্দ করি না আমি।'

'কাগজপত্র ঠিক আছে আমাদের, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'আছে। শয়তান লোক জীবনে অনেক দেখেছি, তাদের দেখলেই চিনতে পারি। ব্যাটারা ডাকাতের বংশধর, অপরাধ-প্রবণতা রক্তে মিশে আছে। ওদেরকে বিশ্বাস নেই...চলো, নামি।'

জেটিতে নামল কিশোর আর ওমর।

'এখানে একজন থাকলে হত না?' মুসা বলল। 'প্লেনটার পাহারায়। নিয়ে পালায় যদি?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বব বলল।

'এতখানি সাহস দেখাবে, মনে হয় না,' বলল ওমর। 'আর চাইলেও থাকা যাচ্ছে না। আমাদের সবাইকে যেতে বলছে। হাত নাড়ছে কিভাবে দেখছ? হারামজাদা! বাপদাদা ছিল চোরের বাচ্চা, ব্যাটা অফিসারি ফলাচ্ছে।' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

উষ্ণমণ্ডল। আগুন ঢালছে সূর্য। দরদর করে ঘামতে ঘামতে পুরানো, জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। অযত্নে নষ্ট হওয়া পথ পেরিয়ে একটা টিলার গোড়ায় চলে এল। টিলার গা বেয়ে উঠে গেছে পাথরের সিঁড়ি, মাথায় পাথরে তৈরি একটা পুরানো বাড়ি, বন্দরের দিকে মুখ করা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল অফিসার, পেছনে তাকিয়ে ইশারা করল অভিযাত্রীদের, ওঠার জন্যে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?' বিড়বিড় করল মুসা। 'আল্লাহ রে! কি যে আছে কপালে...'

'জেলখানা না-তো?' আপনমনেই বলল কিশোর।

'মারছে রে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এই কিশোর, জেলখানা বলছ কেন?'

'সে-রকমই মনে হচ্ছে আমার, তাই।'

'আমারও মনে হচ্ছে,' ওমর সায় দিল। 'অনেক বন্দরেই কাস্টমস অফিসে জেলখানা না হোক, অন্তত হাজতখানা থাকে, আর এটা তো দেশই ডাকাতের।'

যেখানেই নিয়ে যাক, না গিয়ে উপায় নেই, তাই অফিসারের পিছু পিছু চলল ওরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মিনিট কয়েক পরেই স্প্যানিশ আমলে খোদাই করা চমৎকার দরজা পেরিয়ে সুন্দর একটা অফিসঘরে ঢুকল। দামী পুরানো ধাঁচের টেবিলের ওপাশে ভারি চেয়ারে বসে আছে ফেকাসে কালো একটা লোক, একটা জিন্দালাশ যেন, দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সশস্ত্র পুলিশ।

হাত তুলে সালাম জানাল ওমর, ভাঙা স্প্যানিশে শুভেচ্ছা জানাল, 'বিয়েনো দিয়াজ, সিনর।'

শীতল কণ্ঠে শুভেচ্ছা ফিরিয়ে দিল লোকটা, কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে কাগজপত্র চাইল। সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে একে একে দেখছে অভিযাত্রীদের। ওমর কাগজ দিতেই সেগুলো নিয়ে টেবিলে বিছাল, কোন তাড়াহুড়ো নেই। পাসপোর্টের একটা করে পাতা উল্টে দেখছে, এত ধীর, অসহ্য লাগছে কিশোরের। ওমরের দিকে চেয়ে দেখল, চোখ জ্বলছে তার।

'ইংরেজি জানেন?' রাগ চেপে খুব ভদ্রভাবে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল ওমর।

শুনলই না যেন লোকটা।

'মেজাজ ঠিক রাখাই কঠিন,' সঙ্গীদের দিকে চেয়ে নিচুকণ্ঠে বলল ওমর। 'এই ব্যাটা জ্বালাবে, বলে রাখলাম, দেখো।'

খুব ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে সময়। হাই তুলল মুসা। অস্বস্তি প্রকাশ করছে বব হাত-পা নেড়ে। কিশোর আর ওমর শান্ত রয়েছে। জানে, অস্থির ভাব দেখালে আরও বেশি দেরি করবে লোকটা, তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে।

অবশেষে মুখ তুলে তাকাল লোকটা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কিছু।

'কি বলল?' জানতে চাইল মুসা।

'পুরোপুরি বুঝিনি,' বলল ওমর, 'কাগজে গোলমাল আছে, এ-রকমই কিছু বলল,' ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

চলল দীর্ঘ কথা কাটাকাটি। ভাঙা স্প্যানিশে থেমে থেমে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে ওমর, আর অমনি মেশিনগান ছোটায় জিন্দালাশ। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ওমর। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'ব্যাটা বলছে, আরেকটা কি কাগজ না কি...ব্যাটার মাথা ছিল, আনতে ভুলে গেছি আমরা!'

'কি করতে বলছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জিজ্ঞেস করিনি। করছি,' আবার লোকটার দিকে ফিরল ওমর।

ওমরকে কিছু বলে, কড়া গলায় কি যেন আদেশ দিল লোকটা। মার্চ করে দরজার দিকে চলে গেল পুলিশ দু'জন।

সঙ্গীদের জানাল ওমর, 'বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এখন এই দু'জনের সঙ্গে যেতে হবে। এসো, যাই। কথা না শুনলে আরও খারাপ হবে।'

পুলিশদের পিছু পিছু আরও কিছু সিঁড়ি পেরিয়ে শাদা চুনকাম করা একটা ঘরে এসে ঢুকল, আসবাবপত্র বলতে নেই, গোটা চারেক কাঠের কাঠামো যেন শুধু দেয়াল ঘেঁষে ফেলে রাখা হয়েছে, ওগুলো তক্তপোষ না চৌপায়া, না চৌকি, যারা বানিয়েছে তারাই বলতে পারবে। চার অভিযাত্রীকে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেল দুই পুলিশ, দরজায় তালা আটকানোর শব্দ শোনা গেল।

ভুরু কুঁচকে ওমরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি ব্যাপার?'

'বুঝতে পারছি না!' আস্তে মাথা নাড়ল ওমর। 'কাগজপত্রে কোন গোলমাল নেই, আমি শিওর। তাহলে আটকাল কেন? নিশ্চয় ঘুষ খাওয়ার জন্যে। চেয়ে ফেললেই পারে। যত তাড়াতাড়ি চায়, ততই আমাদের জন্যে মঙ্গল।'

'ঘুষ!' হাতের আঙুল মুঠো হয়ে গেছে মুসার।

'এটা বাড়তি ইনকাম এখানকার লোকের,' কিশোর বলল। 'কিছু করার নেই, চাইলে দিতে হবে, নইলে ছাড়বে না।'

'হারামির বাচ্চারা!' দাঁত দিয়ে জোরে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সহকারী গোয়েন্দা। 'মড়া হারামিটার নাক ভেঙে দিতে পারতাম।'

বিষণ্ণ হাসি হাসল ওমর। 'আইন-কানুন ছাড়া, এসব ছোট ছোট রাজ্যের এই-ই রীতি। দুনিয়ায় এমন জায়গা আরও অনেক আছে। ঘুষ চাইলে দিয়ে দেয়া ভাল, নইলে গোলমাল পাকিয়ে এমন অবস্থা করে ফেলবে, শেষে কয়েক গুণ খরচ করেও পার পাওয়া মুশকিল। ওরা সব পারে। এই যে, হাজতে এনে ভরে রাখল, কি করতে পারলাম?'

চুপ করে গেল মুসা। কিশোর চুপচাপ। বব মনমরা, সব দোষ যেন তারই, এমনি ভাব।

ঘরটা যেন একটা চুলো। একটি মাত্র জানালা, সাগরের দিকে, তাতে লোহার মোটা গরাদ। জানালায় দাঁড়ালে বন্দরের অনেকখানি চোখে পড়ে, উভচরটাকে দেখা যায় পরিষ্কার, এই বড় জোর পোয়াটাক মাইল দূরে হবে।

দীর্ঘ সময় যেন আর কাটতে চায় না। এক যুগ পর যেন এক ঘণ্টা পেরোল, আরেক ঘণ্টা, আরও এক ঘণ্টা। বনে ঢাকা পাহাড়ের ওপারে অস্ত যেতে শুরু করল লাল টকটকে সূর্য। নতুন বিপদ দেখা দিল, মশা। বিশাল একেক ঝাঁক। জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকছে যেন মশার মেঘ। বিচিত্র গান গেয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল মাথার ওপর। যেন বলছে, 'কি মিয়ারা, আছ কেমন? দাঁড়াও, আলোটা খালি যাক, তারপর শুরু করব। এক ফোঁটা রক্ত রাখব না কারও শরীরে।'

শুয়ে ছিল মুসা, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আর না!' চেঁচিয়ে উঠল, 'আর

সহ্য করব না! যে কেউ বলবে, আমরা চোরছ্যাঁচোর নই, ভদ্রলোক! এই, এসো তোমরা, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি!'

'হ্যাঁ, কিছু একটা করা দরকার,' ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল ওমর, জানালার দিকে এগোল। বন্দরের দিকে চেয়েই চমকে উঠল। 'আরে, হচ্ছেটা, কি!'

ছুটে এসে ওমরের আশেপাশে দাঁড়াল সবাই। উভচরটাকে ছেঁকে ধরেছে যেন পুলিশ। ঢুকছে, বেরোচ্ছে। বড় একটা প্যাকেট নিয়ে বেরোল এক পুলিশ। হাত নেড়ে কি সব বলছে।

'কাস্টমসের লোক,' বলল ওমর, 'জিনিসপত্র চেক করছে বোধহয়। আমরা নেই, অথচ আমাদের জিনিস চেক করছে। শয়তানের দল! আর চুপ করে থাকব না।'

গটমট করে দরজার দিকে এগোল ওমর, কিন্তু সে হাত দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। সেই দুই সরকারী কর্মচারী—একজন যে তাদেরকে আনতে গিয়েছিল বোট নিয়ে, আরেকজন সেই জিন্দালাশটা। পেছনে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছয়জন পুলিশ।

'এসবের মানে কি?' কড়া গলায় জানতে চাইল ওমর।

জবাব পাওয়া গেল না। ঘরে ঢুকল দুই অফিসার। মুসা ভয়ানক রেগে গেছে দেখে, তার বাহুতে হাত রাখল একজন। ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল মুসা।

'ওরকম করো না!' তাড়াতাড়ি বলল ওমর। 'লাভ হবে না, আরও খারাপ হবে। শান্ত থাকো।'

ওমরের সামনে এসে দাঁড়াল জিন্দালাশ। কথার মেশিনগান ছোটাল কয়েক মুহূর্ত, তারপর যেমন শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ করে থেমে গেল।

'কি বলল হারামজাদা!' রাগ দমন করতে পারছে না মুসা।

'চোর।'

'চোর!'

'একটা আমেরিকান প্লেন নাকি চুরি গেছে। আমাদের গতিবিধি সন্দেহজনক! তাই সার্চ করবে।'

'দোজখে জ্বলবে!' হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে মুসা। এত বড় মিথ্যা! বললেন না, প্যান-আমেরিকানের অফিসে দেখা করতে?'

'বলেছি।'

'কি বলল?'

'ডিপার্টমেন্টাল বস্ ছুটিতে, ম্যালেরিয়া হয়েছে, তাই পাহাড়ের ধারে কোথায় নাকি হাওয়া বদলাতে গেছে। অফিসের অন্য কেউ কিছু বলতে পারল না।'

ঢোক গিলল মুসা। কথা হারিয়েছে।

'হুঁ!' আস্তে করে বলল কিশোর, 'আরেকটা মিথ্যে। ষড়যন্ত্র।'

'বোঝাই যাচ্ছে,' মাথা দোলাল ওমর, 'কিন্তু করার কিছু দেখছি না। সার্চ করতে চাইছে, মানা করতে পারব না। তাহলে সুযোগ পেয়ে যাবে। ওরা খালি ছুঁতো খুঁজছে এখন। জেলে নিয়ে গিয়ে একবার ভরে দিলে, ক'মাস আটকে থাকব কে

জানে।'

'বাহ্, চমৎকার জায়গা খুঁজে বের করেছি,' মুখ বাঁকাল মুসা, 'ঘাঁটি করার জন্যে।'

'ওসব বলে আর লাভ নেই এখন,' বলল কিশোর, 'ওরা যা করতে চায় করুক। বাধা দিতে গেল উল্টো ফল হবে। সার্চ করে পাবে না কিছু। লুট করে নেয়ার মত নগদ টাকাও নেই সঙ্গে, লেটার অভ ক্রেডিট আর ট্রাভেলারস চেক নিয়ে ভাঙাতে পারবে না।'

সার্চ করতে জানে লোকগুলো। অভিযাত্রীদের পকেটে যা যা ছিল সব বের করে নিল, এমনকি ববের বাবার চিঠি, ম্যাপ আর ডাবলুনটাও। সব একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে আবার তালা আটকে দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ বলল মুসা, 'হারামির বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করলেন না, আমাদের প্লেনে কি করছিল?'

'লাভ কি?' শান্তকণ্ঠে বলল ওমর। 'বড় বেশি রেগে গেছ তুমি, মুসা, মাথা ঠাণ্ডা করো। এমন অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে পড়লে বিপদ আরও বাড়বে। ভেব না, এত সহজেই ছেড়ে দেব ব্যাটাদের। আমি বেদুইনের বাচ্চা, এখনও সময় হয়নি কিছু করার।'

'কিন্তু মোহর আর ম্যাপটাও তো নিয়ে গেল!' উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বব।

'গেছে, গেছে, কি আর করা?' হাত নাড়ল ওমর।

'বাধা দিলেন না?'

'কি হত? রেখে যেত? সন্দেহ আরও বাড়ত ওদের।'

এমনিতে কি সন্দেহ হবে না?'

'কোন কারণ দেখি না। মোহরটা একটা সাধারণ সুভনির। আর ম্যাপ থাকতেই পারে বিমানে, পাইলটের দরকার পড়ে। আমার ম্যাপই তোমার কাছে ছিল, বলতে অসুবিধে কি?'

'কিন্তু ম্যাপটা একটু অন্য ধরনের, এটা বোঝার বুদ্ধি নিশ্চয় ওদের আছে। মোহর আর ম্যাপ মিলিয়ে যদি গুপ্তধন ভেবে বসে?'

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ ভাবছে কিশোর, হঠাৎ ডাকল, 'এই, এই দেখে যাও! জলদি!'

'কী?' দুই লাফে কিশোরের পাশে চলে এল মুসা।

'এখন বুঝতে পারছি সব!' কেমন যেন খুশি খুশি শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'দেখো, সরকারী লোকের সঙ্গে কে যাচ্ছে। ওই গরিলা-মুখটাকে চিনতে পারছ?'

'খাইছে! হ্যামার!'

হাসল কিশোর। 'বুঝতে পারছ তো এখন, কেন কি ঘটছে? দিনের আলোর মত পরিষ্কার।'

'ব্যাটা তো একটা আস্ত গরিলা,' বলল ওমর। 'কিন্তু এখানে কি করছে?'

'এখান পর্যন্ত ধাওয়া করবে, ভাবিনি,' প্যান্টের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'একবারও যদি মনে পড়ত, অন্য ব্যবস্থা করতাম...'

'কিন্তু ও জানল কি করে, আমরা এখানে আসছি?'

'মুসা, বব,' বলল কিশোর, 'মনে পড়ে, রাতে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম, ম্যাপ দেখছিলাম, দরজার কাছে পায়ের ছাপ ফেলেছিল কেউ? পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল ম্যাট? সন্দেহ করেছিলাম না, হ্যামার? ঠিকই তাই। আস্ত একটা গাধা আমি, আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সে-রাতের পর লস অ্যাঞ্জেলেসে আর হ্যামারের চেহারা দেখিনি, কেন সন্দেহ করলাম না কিছু? আসলে, ধরেই নিয়েছিলাম, সে মাথামোটা এক খুনে, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ভাবিনি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুনে জেনে নিয়েছে আমরা কোথায় আসছি। আগেই এসে বসে আছে এখানে। ভজিয়ে রেখেছে সরকারী দোস্তদের। সে নাবিক, এর আগেও এখানে তার আসাটা বিচিত্র কিছু নয়, হয়তো তখন থেকেই জানা শোনা। নাহ্, সব কিছু ওলট-পালট করে দিল মিস্টার গরিলা।'

'কিন্তু আমার ম্যাপ আর মোহরের কি হবে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বব। 'চিঠিটাও তো নিয়ে গেছে।'

'মোহরটা আর ক'ডলার? নিয়েছে নিক। চিঠি আর ম্যাপ নিয়ে কচুটাও করতে পারবে না।'

'মানে?'

'খামটাই শুধু আসল, ভেতরের চিঠি আমার লেখা, যা মনে এসেছে তাই লিখেছি। আসল চিঠিটা মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছে, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেবেন তিনি। চিঠিটার ওপর হ্যামারের চোখ পড়েছিল, তাই সাবধান হয়েছি।'

'কিন্তু ম্যাপ?'

'হ্যাঁ, ওটা দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবে হ্যামার,' মুচকি হাসল কিশোর। 'চুলো থেকে আগুন নিয়ে সিগারেট ধরাতে পারবে...'

'কি বলছ?'

'বললাম না, খামটাই শুধু আসল। ভুল ম্যাপ, ম্যাপ না থাকার চেয়েও খারাপ। নতুন করে চিঠি লিখতে পেরেছি, আর একটা ম্যাপ আঁকতে পারব না? নিজেকে খুব চালাক ভেবেছে হ্যামার, খুশিতে নিশ্চয় লাফাচ্ছে এখন। লাফাক যত খুশি।'

হাহ্ হাহ্ করে হাসল ওমর। 'নাহ্, তুমি একখান জিনিস, কিশোর পাশা। এখন বুঝতে পারছি, ডেভিস ক্রিস্টোফারের মত লোকও তোমাকে এতটা পাত্তা দেয় কেন!'

লজ্জা পেল কিশোর। চুপ করে রইল।

'তাহলে?' মুসা বলল। 'এখন কি করছি আমরা? বুঝলামই তো, ঘুষের জন্যে আটকায়নি।'

'চুপ করে থাকব,' বলল কিশোর। 'দেখি না, কি করে?'

'কী! এখানে? সারারাত?'

'ওরা রাখলে থাকতেই হবে,' শান্ত কিশোরের কণ্ঠ। প্রায়ই অবাক হয় মুসা, সাংঘাতিক বিপদের সময়েও উত্তেজিত হয় না গোয়েন্দাপ্রধান, এত শান্ত রাখে কি

করে নিজেকে? 'হ্যামারের যা দরকার, পেয়েছে, ওগুলো নিয়ে ও এখান থেকে চলে গেলেই হয়তো আমাদের ছেড়ে দেয়া হবে।'

সূর্য অস্ত গেছে। সবুজ জঙ্গলের ওপর আকাশের গাঢ় নীলিমা বেগুনী হতে শুরু করেছে, মাঝে মাঝে লাল ছোপ, শিগগিরই কালো হয়ে যাবে সব রঙ।

রাত নামল, হঠাৎ করেই বড় বেশি নীরব হয়ে গেল চারদিক, উষ্ণমণ্ডলের গভীর নীরবতা। অভিযাত্রীদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মশার পাল। খিদেয় পেট জ্বলছে, গরম, তার ওপর এই মশার মাঝে কি করে যে রাতটা কাটবে, কে জানে।

সাত

জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল ভোরের নরম আলো। শব্দটা কানে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল ওমর। 'আরে! কি ব্যাপার!' তার চিৎকারে অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেল।

স্তব্ধ বাতাসে কাঁপন তুলেছে বিমানের ইঞ্জিন।

'প্যান-আমেরিকানের বিমানটা,' হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা, 'চলে যাচ্ছে হয়তো।'

লাফ দিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটে গেল ওমর। 'আমাদেরটা!'

অন্যেরাও ছুটে এল জানালার কাছে। পোতাশ্রয়ের মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সিকোরস্কি।

'কি করছে?' বিড়বিড় করল।

'প্যান-আমেরিকানের কেউ সরিয়ে নিচ্ছে,' বলল মুসা। 'জাহাজটা হাজ ঢুকবে হয়তো, জায়গা করে দিচ্ছে।'

'আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ওমর। 'জাহাজ ঢোকার অনেক জায়গা আছে। দেখছ না, খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে?' ঝাপটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, এগোল দরজার দিকে।

এই সময় খুলে গেল পাল্লা, একজন পুলিশের হাতে খাবারের ট্রে। তাতে একটা জগ, কয়েকটা কাপ-পিরিচ, একটা পাঁউরুটি আর কিছু ফল। পেছনে রয়েছে আরও দু'জন।

সামনের লোকটার পাশ কাটিয়ে অন্য দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে গেল ওমর। একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে এল পথে, এক ছুটে পথ পেরিয়ে একেবারে পানির ধারে। বিমানটা তখন অনেক দূরে, পোতাশ্রয়ে ঢোকার মুখের বাইরে। থমকে দাঁড়াল সে, বোবা হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সেদিকে। তার পেছনে এসে দাঁড়াল কিশোর, মুসা আর বব।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে ঘুরে তাকাল ওমর প্যান-আমেরিকান হ্যাঙারের দিকে, শাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক চেয়ে রয়েছে উভচরটার দিকে। তাদের দিকে দৌড়ে গেল সে।

'প্লেনটা কে নিল, জানেন?' হাত তুলে উভচরটাকে দেখিয়ে বলল ওমর।

'নিশ্চয়ই,' বলল হাসিমুখ এক তরুণ, প্যান-আমেরিকানের এক মেকানিক—বুকের কাছে এমব্রয়ডারি করা প্রতীক চিহ্ন আর লেখা দেখেই সেটা বোঝা গেল। 'আপনারা এনেছিলেন, না?'

'হ্যাঁ!'

'ওকে তাই বলছিলাম,' পাশের সহকর্মীকে দেখিয়ে বলল তরুণ। 'গতকাল নামতে দেখেছি আপনাদের, তীরে উঠতে দেখেছি। এখানে তেল ভরে খাঁড়ির বারের ডিপো থেকে নিলেন কেন?'

ভুরু কুঁচকে গেল ওমরের। 'খাঁড়ির ধারে! তেল নিতে! কখন গেলাম?'

'কাল রাতে। কয়েকজন লোক গিয়ে ওখানকার ডিপো থেকে তেল আনল, ওই বিমানটার কথা বলে।'

নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল ওমরের। 'আমাদের সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে পুলিশ, চোর সন্দেহে আটকে রেখেছে সারারাত,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'তার মানে প্লেনটা জালিয়াতি করে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে।'

'অ্যাঁ!' আস্তে মাথা ঝোঁকাল তরুণ মেকানিক। 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। ফাঁদে ফেলেছিল আপনাদের।'

শব্দ করে হাসল তার সহকর্মী, কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই। 'ওই খট্টাসগুলো! ওরা না পারে কি!...চিপিতে ফেলেছে বুঝি?'

'ভালমতই,' বলল ওমর। 'জিনিসপত্র লুটপাট করবে, এটা ধরেই রেখেছিলাম, কিন্তু বিমান নিয়ে ভাগবে...। কারা নিল?'

'হ্যামারকে দেখলাম, গরিলাটা...'

'কিন্তু সে-তো প্লেন চালাতে জানে না...'

'তার দোস্ত নাকি জানে। গত হপ্তায় এসেছিল হ্যামার, সিডনি নামে একজনকে সঙ্গে নিয়ে। একটা প্লেন চাইছিল।'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল ওমর। 'আর কি কি করেছে?'

'শহরে কি করেছে না করেছে, জানি না। তবে আমার বসকে বলছিল, তাদের একটা প্লেন দরকার, খুব জরুরী। ভাড়া বাকি রাখতে চেয়েছে, বস্ রাজি হয়নি।...শহরে অবশ্য বার দুই অ্যালেন কিনির সঙ্গে দেখেছি ওকে।'

'কিনি?'

'পুলিশের চীফ। এটা সরকারী টাইটেল। আসলে ও এখানকার গ্যাঙ লীডার, ডাকাতদের চীফ।'

'মড়াটা না-তো?'

'ভাল নাম দিয়েছেন। হ্যাঁ, মড়াটাই। ওর কাছ থেকে দূরে থাকবেন, সাহেব, বিপদে পড়বেন নইলে, বলে দিলাম। খুব খারাপ লোক।'

'সেটা বুঝেছি,' মাথা কাত করল ওমর। 'আমাদের প্লেনে ক'জন ঢুকেছে, দেখেছেন?'

'না, আমি দেখিনি,' মাথা নাড়ল তরুণ। সহকর্মীর দিকে চাইল, সে-ও মাথা নাড়ল।

'আমি দেখেছি,' এগিয়ে এল আরেক মেকানিক। 'চারজন। হ্যামার, তার মাতাল দোস্ত সিডনি, ইমেট চাব, আর ম্যাবরি।'

'ইমেট চাব!' ঠোঁট ছড়াল ওমর। ম্যাবরি! এ-কেমন নাম?'

'যেমন নামের বাহার, তেমনি লোক। হারামির একশেষ। ইমেট চাব এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে—পুলিশ খুন করে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। এখানে এসে শান্তি তো দূরে থাক, উলটো পুলিশের সহযোগিতা পাচ্ছে, আছে রাজার হালে। পানির ধারে একটা হোটেল চালায় যতরকম বেআইনী ব্যবসা করে। সঙ্গে পিস্তল রাখে সব সময়। ওর সামনে দাঁড়াতে চাইলে মেশিনগান নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।'

'আর ম্যাবরি?'

'ম্যাবরি ভেনাবল। নিগ্রো, ওর মত শয়তান লোক খুব কমই আছে। অ্যালেন কিনির পোষা কসাই, যত রকম কুকাজ আছে, সব করে। দুই পকেটে দুটো ক্ষুর থাকে সব সময়। আমার এক দোস্ত ব্যক্তিগতভাবে চেনে ম্যাবরিকে, সে বলেছে, ক্ষুর দিয়ে মানুষ জবাই করে নাকি দারুণ আনন্দ পায় নিগ্রোটা। এখানে সব্বাই ভয় করে ম্যাবরিকে। ও আপনার বিমানে উঠেছে, তার মানে এসবের পেছনে অ্যালেন কিনির হাত রয়েছে।'

'চমৎকার একটা গ্রুপ,' কঠিন শোনাল ওমরের কণ্ঠ।

'এর চেয়ে চমৎকার আর এদিকে টর্চ নিয়ে খুঁজলেও পাবেন না,' নাক কুঁচকাল মেকানিক।

দ্রুত ভাবছে ওমর। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, টিলা বেয়ে নেমে আসছে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ। 'আপনার বস্ কোথায়?' মেকানিককে জিজ্ঞেস করল সে।

'ওই তো, আসছে,' ওমরের পেছনে দেখিয়ে বলল মেকানিক। 'এখানকার অফিস-সুপার, নাম হোস বার্গ। বোঝাতে পারলে তার কাছে সাহায্য পাবেন।'

ঘুরে দাঁড়াল ওমর। হাসিখুশি একজন লোক এগিয়ে আসছে, চওড়া কাঁধ, গায়ে ধবধবে শাদা হাওয়াইয়ান শার্ট, পরনে শাদা প্যান্ট, পেশীবহুল শরীর। কাছে এসে দাঁড়াল সুপারিনটেনডেন্ট।

'গুড মর্নিং,' হাত বাড়িয়ে দিল ওমর। 'এই মাত্র আমার প্লেন চুরি গেল।'

'তাই নাকি?' হাসল হোস বার্গ। 'এইমাত্র দেখলাম গেল। আপনাকে এখানে দেখে ভাবছিলাম, ব্যাপার কি। বুঝলাম এখন।'

'পালিয়ে যাবে কোথায়?...আপনার এখানে ওয়্যারলেস আছে?'

'আছে।'

'গুড,' এগিয়ে আসা পুলিশদের দিকে চেয়ে দ্রুত বলল ওমর, 'আসছে! শুনুন, আমার নাম ওমর শরীফ। নিউ ইয়র্কে আপনাদের হেড অফিসে চেক করতে পারেন ইচ্ছে করলে। যে বিমানটা নিয়ে গেল, আপনাদেরই, নিশ্চয় জানেন। গত হপ্তায় ভাড়া নিয়েছিলাম। আরেকটা প্লেন এখন দরকার আমাদের। ওই প্লেনটা দেখা যায়? ভাড়া? বিক্রিও করতে পারেন।'

ওমরের চোখে চোখে তাকাল বার্গ। 'এটা কি করে দিই,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'একটাই আছে, রিজার্ভ রেখেছি, জরুরী কাজের জন্যে।'

'আমার কাজটাও খুব জরুরী। কাছাকাছি আরেকটা বেস কোথায় আপনাদের?'

'ম্যারাকিবো।'

'তারমানে খবর পাঠালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরেকটা প্লেন আনিয়ে নিতে পারবেন। এটা দিয়ে দিন আমাকে।'

'নিউ ইয়র্ক যদি বলে।'

'তাহলে এখুনি যান, প্লীজ, খবর নিন। আমার কাগজপত্র সব কিনির কাছে, আনতে যাচ্ছি। যদি প্লেনটা আমাকে দেন, তো পেট্রোল ট্যাংক ভরে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি।'

'দেখি, কি করা যায়।'

'আর, চব্বিশ ঘণ্টা খাইনি, কিছু খাবার যদি...'

হাত তুলল সুপারিনটেনডেন্ট, 'ওসব হবে। যান, এসে পড়েছে। সাবধানে থাকবেন!'

'থ্যাংকস,' বলে ঘুরল ওমর। এসে গেছে পুলিশেরা। তাদের সঙ্গে সেই অফিসার, যে মোটরবোটে করে এসেছিল নিতে।

সঙ্গে যেতে ইশারা করল লোকটা। দ্বিতীয়বার বলার আর দরকার হলো না, পা বাড়াল ওমর, কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল। তার সঙ্গে তিন কিশোর।

অভিযাত্রীদেরকে আবার নিয়ে আসা হলো অ্যালেন কিনির অফিসে। মুখ তুলে তাকাল লোকটা।

'শোনো,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ওমর, রাগে স্প্যানিশ বলতে ভুলে গেছে, ইংরেজি বলছে, 'অনেক জ্বালিয়েছ, অনেক সয়েছি, আর না! কি মনে করেছ? এদেশে আমি একা? বন্ধুবান্ধব আমারও আছে এখানে, তারা ইতিমধ্যেই ওয়্যারলেস করে দিয়েছে নিউ ইয়র্কে, প্যান-আমেরিকান হেড অফিসে। ওখানকার পুলিশের কানেও যাবে কথাটা। সবার সঙ্গেই শয়তানী? জিনিসপত্রগুলো কোথায়, জলদি বের করো।'

ইংরেজি বুঝল কিনা কিনি, বোঝা গেল না, হয়তো ওমরের ভাবভঙ্গিতেই অনুমান করে নিয়েছে, হাত তুলে দেখিয়ে দিল টেবিলের এক ধারে জড়ো করে রাখা জিনিস, যা যা বের করে এনেছে চারজনের পকেট থেকে, সব। নাটকীয় ভঙ্গিতে কঙ্কালসার হাত নেড়ে শান্ত কণ্ঠে কিছু বলল স্প্যানিশে।

'কি বলল শয়তানের বাচ্চা?' জানতে চাইল মুসা।

'যা বলবে ভেবেছি—মাফ চাইছে। আমাদের দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে লজ্জিত। হারামজাদা!'

'প্লেনটা চুরি করল কেন জিজ্ঞেস করেছেন?'

'কি লাভ? বললে কি ফেরত আনবে? কি হয়েছে ভালমতই জানে সে, আমরা জানি এটাও জানে, ওকে বলে কি হবে? চলো, বেরিয়ে যাই। হোস বার্গ বিমানটা দিলে চলে যেতে পারব। ম্যারাবিনাকে আর ঘাঁটি বানানো যাবে না। তাতে কি?

দরকার পড়লে বারমুডায় চলে যাব, যত দূরেই হোক।'

কথা বলতে বলতেই টেবিল থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে যার যার হাতে দিল ওমর। 'কারও কিছু বাদ পড়েছে?'

'আমার মোহর,' বব বলল। 'মড়াটা রেখে দিয়েছে।'

'সোনার টুকরো হাতে পেয়েছে, লোভ সামলাতে পারবে ওর মত লোক?' বলল ওমর। 'ম্যাপ, চিঠি আর মোহর বাদে সবই পেয়েছি।...দাঁড়াও,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দেখল সে, 'না, নেই। খুচরো টাকা বাদে যা ছিল, সব রেখে দিয়েছে। তোমাদের?'

'আপনারটা নিয়েছে, আমাদেরগুলো কি আর রাখবে?' বলল কিশোর। 'দেখার দরকার নেই, চলুন, জলদি বেরোই। যা পেয়েছি, এতেই চলবে। ছেড়ে যে দিচ্ছে, এই বেশি।'

রওনা হওয়ার জন্যে ঘুরল ওমর, তার বাহু চেপে ধরে ফেরাল বব। 'ওই যে, মোহরটা! ওই যে, মোহরটা! ওই যে, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায়।'

দেখতে পেল ওমর। ওরা আসার আগে বোধহয় মোহরটা পরীক্ষা করেছিল কিনি, সাড়া পেয়েই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছে গ্লাসের তলায়। মনে করেছে, দেখতে পাবে না কেউ।

ধৈর্য হারাল ওমর, চোরটাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। কিছুটা শিক্ষা অন্তত দেয়া দরকার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল মোহর, বাধা দিলেই কষে চড় লাগিয়ে দেবে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিনি। সাপের মত ছোবল হানল যেন তার হাত, ওমরের আগেই তুলে নিল মোহরটা।

'চোরের বাচ্চা চোর!' গাল দিয়ে উঠল ওমর। মুঠো হয়ে গেছে হাত, টেবিলের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে কিনিকে ধরার ইচ্ছে।

ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল কিশোর, চেঁচিয়ে উঠল, 'না না! সরে যান!'

থমকে গেল ওমর, কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে চেয়ে দেখল, রাইফেল তুলেছে এক পুলিশ।

চোখের পলকে সরে গেল ওমর। বন্ধ ঘরে রাইফেলের আওয়াজই কামানের শব্দের মত মনে হলো।

করডাইটের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। প্রচণ্ড শব্দের রেশ মিলিয়ে যেতেই বড় বেশি নীরব মনে হলো, শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ। কিন্তু এসব খেয়াল করছে না ঘরের কেউ, বোবা হয়ে চেয়ে আছে কিনির দিকে।

স্থির হয়ে আছে কিনি, মোহর ধরা মুঠোবদ্ধ হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছে, শার্টের ওখানটায় রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পুরো দুই সেকেণ্ড একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর ধুড়ুম করে পড়ল টেবিলের ওপর, কেঁপে উঠল ঘর। হাত থেকে ছুটে গেছে মোহরটা। সোনালি একটা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে যাচ্ছিল, মাঝ পথেই ধরে ফেলেছে ওমর। পরক্ষণেই দৌড় দিল দরজার দিকে। 'জলদি এসো!

আমাদের দোষ দেবে ওরা।'

বেরিয়ে গেল ওমর। তার পেছনে মুসা, তাকে আটকানোর চেষ্টা করল সেই অফিসার। কিন্তু ব্যায়ামবীরের বেমক্কা এক ঘুসি পেটে লাগতেই উঁক করে বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে একজন পুলিশের গায়ে ফেলেই বেরিয়ে এল মুসা। তার ঠিক পেছনেই কিশোর আর বব।

সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামছে ওমর, চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি নামো, পেছনে তাকাবে না!'

যেন উড়ে নেমে এল চারজনে, পথে নেমেই দৌড় দিল হ্যাঙারের দিকে। কড়া রোদ, ভয়ানক গরম। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই, এক-আধজন ভবঘুরে আছে, তারা পথরোধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু থামাতে কি আর পারে? ওমর আর মুসার ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ল পথের ওপর।

পেছনে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে পুলিশের, কিন্তু দেখার জন্যে একবারও পেছনে ফিরল না অভিযাত্রীরা।

'দেখো!' সামনের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ওমর।

দেখল ওরা। রোদে চকচকে একটা চক্র তৈরি করে ঘুরতে শুরু করেছে ফ্লাইং-বোটের প্রপেলার, ওদেরকে আসতে দেখেই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিন চেক করছে নাকি?

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল ওরা। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সুপারিনটেনডেন্টের। 'কী!'

'কিনি গুলি খেয়েছে!' জোরে জোরে দম নিচ্ছে ওমর।

'মরেছে! বড় বেশি বেড়ে গিয়েছিল, আপনি না মারলে আমিই একদিন মেরে বসতাম...'

'...আমি মারিনি! প্লেন রেডি?'

'হ্যাঁ! হেড অফিস বলল, হাজার দশেক দিলেই কিনে নিতে পারেন। কিংবা দৈনিক আড়াইশো ডলার, ভাড়া। পাঁচ হাজার ডিপোজিট রাখতে হবে তাহলে।'

বার্গের কথা শেষ হওয়ার আগেই চেকবুক আর কলম বের করে ফেলল কিশোর, দ্রুত লিখে চলল, এত দ্রুত জীবনে আর লেখেনি। ফড়াত করে এক টানে একটা পাতা ছিঁড়ে গুঁজে দিল সুপারের হাতে।

চেকটা এক নজর দেখেই বলল বার্গ, 'ও, কে! যান।'

বার্গ কথা শেষ করার আগেই দৌড় দিল ওমর, তার পেছনে মুসা আর বব। সবার পেছনে কিশোর।

একে একে উঠে পড়ল তিন কিশোর।

ককপিট থেকে নামল চীফ মেকানিক। তাকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'কত মাইল চলবে তেলে?'

'এক হাজার...'

আর শোনার দরকার মনে করল না ওমর, উঠে পড়ল ককপিটে। সে সীটে বসতে না বসতেই গুলির শব্দ হলো, বিমানের গা ভেদ করে তার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে

গেল একটা বুলেট। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল সে, মুখে ফুটেছে অদ্ভুত হাসি। থ্রটল টানল, গর্জন বেড়ে গেল ইঞ্জিনের। নির্দেশ পেয়ে নাক ঘুরে গেল বিমানের, পানি কেটে দু'ভাগ করে শাদা ফেনা তুলে ছুটল।

ঝটকা দিয়ে স্টিকটা সামনে ঠেলে দিল ওমর। তীক্ষ্ণ 'ছ-ট্-টা-ক' আওয়াজ তুলে পানির আকর্ষণ কাটাল বিমানের নৌকার মত তলা, শূন্যে উঠে পড়ল।

'হউফ্!' করে চেপে রাখা শ্বাসটা ছাড়ল ওমর, হেলান দিল সীটে। 'বাঁচলাম!'

'এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে,' বলল পাশে বসা কিশোর।

'যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। শিক্ষা তো হলো!'

আট

নতুন বিমানটা শুধু পানিতে নামতে পারে, আণ্ডারক্যারেজ লাগানো নেই, ডাঙায় নামতে পারবে না উভচরটার মত। ওটার চেয়ে বড়ও, আট সীট। ভাড়াটে যাত্রী বহনের জন্যে তৈরি হয়েছে, ফলে ককপিট আর যাত্রীদের কেবিন আলাদা করে ফেলা হয়েছে মাঝখানে হালকা দেয়াল দিয়ে। ছোট একটা দরজা আছে, পাল্লার ওপর দিকে কাচ লাগানো, ওখান দিয়ে ককপিট দেখা যায়, ইচ্ছে করলে দরজা খুলে যাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারে পাইলটের সঙ্গে। খুব পুরানো ডিজাইন, এমনিতে এই জিনিস কিছুতেই নিত না ওমর। কিন্তু এখন এটাই যে পেয়েছে, ভাগ্য নেহায়েত ভাল বলতে হবে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

দ্বীপটা কোথায় হতে পারে, আন্দাজ করে কোর্স ঠিক করল ওমর, প্লেনের নাক ঘোরাল সেদিকে। কিশোরের দিকে ফিরল। 'হাল ধরতে পারবে?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'দেখিয়ে দিলে পারব।'

'পারবে। সহজ। উভচরটা দেখা যায় কিনা, চোখ রেখো। হ্যামার খুব ভালমতই চেনে দ্বীপটা, উভচরটাকে কোন দ্বীপের কাছে দেখলে বুঝতে হবে...'

'...ওই দ্বীপটাই খুঁজছি।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'নেমে পড়ব।'

'ওরা দেখে ফেললে?'

'যাতে না দেখে সে-ভাবেই থাকতে হবে। দশ মাইল লম্বা, তারমানে দ্বীপটা খুব ছোট না। ওরা যেদিকে নামবে, তার উল্টোদিকে বা অন্য কোনদিকে অন্য কোথাও নামব আমরা। সঙ্গে রাইফেল বন্দুক কিচ্ছু নেই, খালি হাতে চার চারটে খুনে ডাকাতের সঙ্গে লাগতে গেলে মরব।...আগে থেকে ভেবে লাভ নেই, যখন যা হয়, দেখা যাবে।'

'আকাশে থাকতেই যদি আমাদের দেখে ফেলে?' বিড়বিড় করল কিশোর, নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন।

'দেখলে কি হবে? প্যান-আমেরিকানের ছাপ্পড় মারা ফ্লাইংবোট অনেক আছে,

আমরাই এসেছি জানছে কিভাবে?'

'তা-ও কথা ঠিক। আমাকে প্লেন চালাতে হবে কেন···আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আরে! খেতে-টেতে হবে না? নাড়ীভুঁড়ি সুদ্ধ হজম হয়ে গেল···যাও, তুমি খেয়ে এসো। তারপর আমি যাব।'

'আপনিই যান,' প্লেন চালানোর কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। 'শুকনো কিছু থাকলে পাঠিয়ে দেবেন এখানেই।'

কিশোরের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসল ওমর। 'এসো, এখানে এসে বসো,' পাইলটের সীট ছেড়ে দিল সে।

কিভাবে হাল ধরতে হবে কিশোরকে দেখিয়ে দিল ওমর। বলল, 'বলো তো, গতিবেগ কত? কত ওপর দিয়ে যাচ্ছি?'

মিটার দেখে বলল কিশোর, 'একশো চল্লিশ মাইল।···আট হাজার ফুট।'

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দ্বীপটা চোখে পড়ার কথা। বড় বেশি স্লো,' নাক কুঁচকালো ওমর। 'এসব গরুর গাড়ি চালিয়ে মজা নেই।···ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। যেভাবে বললাম, ধরে থাকো, অন্য কিছু নাড়াচাড়া করবে না। অসুবিধে দেখলেই ডাক দেবে আমাকে।'

'আচ্ছা,' সামনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর, পুরোদস্তুর পাইলটের ঢঙে।

মুচকি হেসে, দরজা খুলে কেবিনে এসে ঢুকল ওমর। তাকে দেখে হাসল বব।

ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। 'আপনি! প্লেন···'

'কিশোর চালাচ্ছে,' হাসছে ওমর।

'কি-শো···,' লাফ দিয়ে উঠল মুসা।

কাঁধ চেপে তাকে বসিয়ে দিল ওমর। 'একবারে খাবার নিয়ে যাও ওর জন্যে।'

এত তাড়াহুড়োর মাঝেও অনেক করেছে হোস বার্গ, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল ওমর। বেশ বড়সড় একটা পাঁউরুটি, আধসেরখানেক পনির, স্লাইস করে ভাজা গরুর মাংস, আর এক কাঁদি কলা রাখা আছে দুই সারি সীটের মাঝখানে। সাংঘাতিক কিছু নয়, কিন্তু তাদের যা অবস্থা, এই-ই রাজার ভোজ এখন।

'গোটা দুই কলা,' বসতে বসতে বলল ওমর, 'দিয়ে এসো কিশোরকে।' ছোট পকেট-ছুরি বের করে এক টুকরো পনির কেটে নিয়ে কামড় বসাল, সেই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে রুটি ছিঁড়ে নিল বড় এক টুকরো। 'খাও···তুমিও খাও,' ববকে বলল।

কিশোর প্লেন চালাচ্ছে, এমন একটা আশ্চর্য খবর শুনে এক মুহূর্ত দেরি করল না মুসা, এক টানে কলা ছিঁড়ে নিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল।

'মোহরটা বাঁচাতে পেরেছেন,' বলল বব, 'সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম,' পকেটে হাত ঢোকাল ওমর। 'এই যে, নাও,' বলে মোহরটা বের করে বাড়িয়ে ধরল।

নিতে গেল বব। ঠিক এই সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। সাঁ করে কোণাকোণি অনেকখানি উঠে গেল বিমান, যেন ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোতের টানে, তারপরই পাথরের মত সোজা পড়ল নিচে, প্রায় দু'শো ফুট নেমে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি

খেল, এগিয়ে চলল আবার।

সীট থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ওমরের শরীর, ধপ করে পড়ল আবার সীটে, হাতের রুটি আলগাভাবে ধরা ছিল, ছুটে উড়ে চলে গেল একদিকে। ববেরও একই অবস্থা। ফিরে আসছিল মুসা, ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে, মেঝেতে গড়াগড়ি খেল, অবশেষে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল কোনমতে, হাঁটুভাঙা 'দ'-এর অবস্থা। 'খাইছে!...আল্লাহ্‌রে, হলো কি?'

পেট চেপে ধরেছে বব। 'সব্বোনাশ!' জোরে জোরে শ্বাস নিল সে। 'মনে হলো, নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে।...ওরকম আরেকবার হলেই গেছি...'

উঠে পড়েছে ওমর। ছুটে গেল ককপিটের দরজার কাছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'জানি না।'

'যন্ত্রপাতি কোনটা নাড়াচাড়া করেছ?'

'কিচ্ছু না। খালি একটা কলা তুলতে যাচ্ছিলাম...অমনি...'

'মেঘের ভেতরে ঢুকেছিল?'

'মেঘ কোথায়? চিহ্নই নেই। আমি তো ভাবছিলাম, কিছু একটা করেছেন কেবিনে, তাতে কোনভাবে কন্ট্রোল অ্যাফেক্ট করেছে।'

'না! খাচ্ছিলাম, আর ববের মোহরটা দিতে যাচ্ছিলাম...'

'...কী!' ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর।

'আরে, ওই ডাবলুনটা। মনে হচ্ছে, সত্যিই জিনের আসর আছে ওটাতে।'

'জিনের আসর?'

'এসব তো বিশ্বাস করি না। কিন্তু তোমাদের মুখেই তো মোহরটার গল্প শুনলাম। যখন যার কাছে যাচ্ছে, তারই ক্ষতি করে বসছে।'

'আমি এখনও বিশ্বাস করি না।'

'আমিও না। কিন্তু যা যা ঘটেছে, সব খতিয়ে দেখো না। প্রথমে, জলদস্যুর জাহাজটার কথাই ধরো। ববের বাবার চিঠি পড়ে বোঝা যায়, কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল ওটায়। ওটার ক্যাপ্টেন মরেছে রহস্যজনক ভাবে। তার সামনে টেবিলে ছিল এই মোহর। কিম এটা হাতে তুলে নিতে না নিতে মরল হ্যামারের ছুরি খেয়ে। ববের বাবা মরল। তারপর দেখো, যে নাবিককে দিয়ে চিঠি আর মোহর পাঠিয়েছিল, সেই নাবিক যে জাহাজে উঠেছিল, তার কি অবস্থা হলো। বার বার দুর্ঘটনায় পড়ল। হ্যামার ওটা ধরেই আছাড় খেল বোরিসের হাতে। বব ওটা পকেটে নিয়ে হোটেল থেকে বেরোতে না বেরোতেই পড়তে যাচ্ছিল ট্রাকের তলায়। তারপর চড়লে তোমরা ট্যাক্সিতে। ড্রাইভার উল্টোপাল্টা ব্যবহার শুরু করল, গুঁতো লাগিয়ে দিল আরেক গাড়ির সঙ্গে। অ্যালেন কিনি মরল গুলি খেয়ে।...তারপর প্লেনটা হঠাৎ এমন করে উঠল।' থামল ওমর। চুপ করে রইল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'কেমন রহস্যময় না? দেখো, কুসংস্কার নেই আমার। কিন্তু এতগুলো ঘটনার কি ব্যাখ্যা? একটা ব্যাপার বোধহয় অস্বীকার করবে না, দুর্ভাগ্য বলে একটা কথা আছে, কোন কোন জিনিসে যেন লেপ্টে থাকে সেই দুর্ভাগ্য, মোহরটার ব্যাপারও হয়তো তাই।'

আবার চুপ করল সে। 'আচ্ছা, ববকে বলি না, মোহরটা ফেলে দিক। কত আর দাম? এমন একটা অলক্ষুণে জিনিস রেখে কি হবে? অযথা ঝুঁকি···আমি খেয়ে আসি।' আবার কেবিনে ফিরে এল ওমর।

টেবিলের ওপর কলার খোসার স্তূপ বানিয়ে ফেলেছে বব আর মুসা।

'কি হয়েছিল?' ওমরকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'উল্টোপাল্টা টিপ মেরেছে, নাকি?···উহ্, কোমর ভেঙে দিয়েছে আমার!' আরেকটা কলা ছিঁড়ে নিল সে।

'কিশোর কিছুই করেনি।' আগের সীটটায় বসে পড়ল ওমর, আরেক টুকরো রুটি ছিঁড়ে নিল।

'কিশোর কিছু করেনি।' কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হাত থেমে গেল মুসার। 'তাহলে?'

'বুঝতে পারছি না। বোধহয়···'

'···ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে!' ককপিট থেকে কিশোরের চিৎকার শোনা গেল। 'ওমর ভাই, জলদি আসুন।'

'দেখে এসো তো,' মুসাকে বলল ওমর। খাওয়া ছেড়ে আবার উঠতে রাজি না।

দেখে এল মুসা। চিবাতে চিবাতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ওমর।

'ডাঙা কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না,' বলল মুসা। 'দিগন্তের কাছে কি যেন। ঝড় হতে পারে।'

হাতের রুটি আর পনির দ্রুত শেষ করল ওমর, ছোট হয়ে আসা কাঁদি থেকে একটা কলা ছিঁড়ে নিয়ে উঠল। ককপিটে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে কিশোর। গম্ভীর। 'ওটা কি?'

এগিয়ে এল ওমর, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল দূরের জিনিসটা, কলাটা পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না। কিন্তু লক্ষণ বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। ঝড়ের এলাকা···যখন-তখন হারিকেন আঘাত হানে। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার···যাও, ওঠো, জলদি কিছু মুখে দিয়ে নাও। সবাইকে তৈরি থাকতে বলো। ঝড়ই আসছে বোধহয়।' কিশোরের খালি করে দেয়া পাইলট সীটে বসে পড়ল সে। দিগন্তে দৃষ্টি স্থির।

মাইল বিশেক দূরে চকচকে ইস্পাত-রঙা সমতল সাগর, সেটা থেকে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে যেন সপ্তমীর চাঁদ-আকারের দ্বীপটা, মাঝখান থেকে চোখা হয়ে উঠে গেছে পাহাড়-চূড়া। ওটার আশেপাশে আরও কয়েকটা দ্বীপ, রহস্যময় নীল মহাশূন্যে যেন ভেসে রয়েছে। তারও পরে গাঢ় নীল একটা বেগুনী মেখলা যেন দিগন্ত ঢেকে দিচ্ছে দ্রুত, খুব দ্রুত, যেন একটা অদৃশ্য হাত প্রকাণ্ড এক নীল চাদর নামিয়ে দিচ্ছে মস্ত এক গম্বুজের ওপর থেকে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে ওমরের। ঝড়ই, সন্দেহ নেই আর। কি করবে এখন? আরও ওপরে উঠে ঝড়ের ওপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, নাকি ঝড় আঘাত হানার আগেই দ্বীপে নামার চেষ্টা করবে? ঝড়টা কত উঁচু, অনুমান করা কঠিন, তার চেয়ে দ্বীপে নেমে নিরাপদ কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করাই ভাল। সিদ্ধান্ত

নিয়ে আর দেরি করল না, থ্রটল খুলে দিল পুরোপুরি, জয় স্টিকটা সামনে ঠেলে দিলে যতখানি যায়, ইঞ্জিনের শক্তি নিংড়ে গতিবেগ যা আছে সব বের করে নিতে চায়।

দরজায় দেখা দিল কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'ভয়ানক বিপদ আসছে,' বিড়বিড় করল ওমর। 'ঝড়কে ছাড়িয়ে যেতে পারব না, পেট্রল যা আছে, কুলোবে বলে মনে হয় না। এসে পড়ার আগেই দ্বীপে নামতে হবে। ঝড় যেদিক থেকে আসছে, দ্বীপে তার উল্টোদিকে কোন একটা খাঁড়ি-টাড়ি পেয়ে গেলে সুবিধে।'

উদ্বিগ্ন দেখাল কিশোরকে। মুখ থমথমে। এগিয়ে আসা ঝড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। 'এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। ভয়ংকর।'

'গতি একশো মাইলের কম না,' ওমরের গলা কাঁপছে। 'পালকের মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে প্লেন। মুসা আর ববকে মেঝেয় শুয়ে পড়তে বলো।'

'দ্বীপে পৌঁছতে পারব?'

'আশা করছি।'

হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে এখন প্লেন। ইচ্ছে করেই নামিয়ে এনেছে ওমর, সুবিধে হবে ভাবছে। গর্জন শুরু হয়েছে সাগরের, ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে যেন বিশাল দৈত্য।

'ঢেউ তো নেই, ব্যাপার কি?'

'উঠবে,' বলল ওমর, 'পাহাড়ের সমান একেকটা। তার আগেই দ্বীপে...'

'আরে, আরে! গায়ে এসে পড়বে নাকি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

বিমানের নাক সামান্য সরিয়ে দিল ওমর। বড় একটা অ্যালবেট্রস উড়ে আসছে দ্রুত, ছড়ানো ডানা, থিরথির করে কাঁপছে পালক, বাঘের তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে যেন হরিণশিশু।

'অবাক কাণ্ড তো!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। 'প্লেনটা দেখতে পাচ্ছে না নাকি?'

বিমানের নাক আরেকটু সরাল ওমর। কিন্তু জেদ ধরেছে যেন পাখিটা, ধাক্কা লাগবেই। ওটাও ঘুরে গেল খানিকটা, বাতাসের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠে গেল আরও, সাঁ করে ছুটে এল। চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না ওমর। দু'হাতে মুখ ঢাকল কিশোর। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল, যেন তার গায়েই এসে পড়বে পাখিটা।

কড়মড়-মড়াৎ করে বিচিত্র শব্দ হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

ফেকাসে মুখ তুলে চাইল কিশোর। 'হায় হায়! বাঁয়ের প্রপেলারটা গেছে!'

জবাব দিল না ওমর, হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কাত হয়ে ভালমত দেখল কিশোর, বাঁয়ের প্রপেলারের পাখাগুলো নেই, শুধু দণ্ডটা দেখা যাচ্ছে, নগ্ন। বাঁ পাশের উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে চুরচুর, গর্তটায় ঠেসে আটকে রয়েছে রক্তাক্ত পালকের একটা বোঝা। 'ইস্‌স্‌!' শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাল সে।

আবার প্রাণ ফিরে পেল ইঞ্জিন।

'এক ইঞ্জিনে চলবে?' খসখসে হয়ে গেছে কিশোরের গলা।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ওমর। উত্তেজনার মুহূর্তে দুটো ইঞ্জিনই বন্ধ করে দিয়েছিল, একটা চালু হয়েছে। উদ্বিগ্ন চোখে সে তাকিয়ে রয়েছে দ্বীপটার দিকে। কালো একটা চাদর দ্রুত এগিয়ে আসছে, উঠে আসছে মাথার ওপর, তার ওপাশে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য। সাগর যেন চকচকে একটা আয়না। 'হয়তো।'

কাঁপন উঠল হঠাৎ সাগরে, শাদা পানির কণা ছিটিয়ে স্যাঁৎ করে তীব্র গতিতে ছুটে গেল বাতাস পানি ছুঁয়ে, ভীষণভাবে দুলে উঠল বিমান। 'এসে গেছে!' শক্ত হাতে জয় স্টিক চেপে ধরল ওমর।...দ্বীপের অবস্থা দেখেছ?

সেদিকেই চেয়ে রয়েছে কিশোর, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় একবার এদিক, একবার ওদিকে কাত হচ্ছে দ্বীপের গাছপালা, অজানা এক দানব যেন যন্ত্রণায় দোমড়াচ্ছে-মোচড়াচ্ছে শরীর। নারকেল আর অন্যান্য গাছের ডাল-পাতা ছিঁড়ে পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

জয় স্টিকটাকে ঠেলে ধরে রেখেছে ওমর, চোখ অস্থির, নামার জায়গা খুঁজছে। দ্বীপের ধার ঘেঁষে থাকা প্রবাল-প্রাচীর ডুবে গেছে এখন রাশি রাশি শাদা ফেনার তলায়।

বিমানের ওপর আঘাত হানল হারিকেন।

আহত মুরগীর মত কেঁপে উঠল ফ্লাইং-বোট, সাঁই করে ঘুরে গেল আধপাক, আবার ওটার নাক ঘোরাল ওমর অনেক পরিশ্রম করে, পরক্ষণেই ডাইভ দিল বিমান নিয়ে। প্রায় খাড়া হয়ে নামতে শুরু করল বিমান। কাঁপছে, দুলছে, দোমড়াচ্ছে জীবন্ত প্রাণীর মত, এগিয়ে যাচ্ছে দ্বীপের ছোট্ট ল্যাগুনের দিকে। মিটারে কাঁটা শো করছে একশো-চল্লিশ, অথচ যে হারে এগোচ্ছে, গতিবেগ তিরিশ-চল্লিশের বেশি না, তারমানে বাতাসের গতি একশো'র ওপরে। ভয়ংকর গতিবেগ। এর সঙ্গে লড়াই করে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্লাইং-বোট প্রবাল-প্রাচীরের দিকে, প্রাচীর চোখে পড়ছে না, তার জায়গায় ফুঁসছে শাদা পানি, ফেনা ছিটাচ্ছে ফোয়ারার মত।

'পারব...,' বলেই থেমে গেল কিশোর, তার অসমাপ্ত কথার জবাব দিতেই যেন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল বাকি ইঞ্জিনটাও।

চোয়াল কঠিন হয়ে গেছে ওমরের, দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতে জয় স্টিকটা ঠেলে ধরে রেখেছে। ল্যাণ্ড করবে কি করে, ভাবছে। সাগরের যা অবস্থা পাঁচ মিনিটও টিকবে না। ডাঙায় নামবে।

'সাঁতরাতে হবে,' ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে বলল ওমর। 'ল্যাণ্ড করাতে পারব না। যেখানেই গুঁতো খাক, গুঁড়ো হয়ে যাবে, ভেতরে থাকলে মরব। লাফ দিতে হবে তার আগেই। ওদের রেডি হতে বলোগে।'

'প্লেনটা বাঁচানো যাচ্ছে না...'

'...আরে দূর, প্লেন! জান বাঁচানোর চেষ্টা এখন। যাও, জলদি যাও।'

কিশোরকে বলল বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওমর, শেষ মুহূর্তের আগে সে লাফ দেবে না। একটা উঁচু জায়গা এখন লক্ষ্য তার, ওখানটাতে উঠছে না ঢেউ।

কিন্তু ওখানে কি পৌঁছতে পারবে? মনে হয় না! একশো ফুট ওপরে রয়েছে প্লেন, প্রতি এক গজ এগোতে গিয়ে এক গজ করে নামছে, এ-হারে···নাহ্, অসম্ভব! কিন্তু হাল ছাড়ল না সে।

সবাই এসে ঢুকল ককপিটে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। সাঁতরানোর জন্য তৈরি। চেঁচিয়ে আদেশ দিল ওমর। 'রেডি!'

'রেডি।' একসঙ্গে জবাব দিল তিন কিশোর।

'বব, যাও!'

দ্বিধা করছে বব। পানি ছুঁই ছুঁই করছে বিমান। আর কয়েক গজ এগোতে পারলেই পৌঁছে যাবে জায়গা মত।

'জলদি!' আবার চেঁচিয়ে উঠল ওমর। 'ডানা ধরে ঝুলে পড়ো! কুইক!'

ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল বব। বাঁ দিকের দরজা খুলে নেমে এল ডানার ওপর, হাত-পা কাঁপছে। ঠিক এই সময় প্রচণ্ড বাতাস এসে ঝাপটা মারল বিমানের গায়ে, সাঁই করে ঘুরে গেল বিমানটা, দুলে উঠল ভীষণভাবে। পিছিয়ে এল অনেকখানি। দরজার ধার থেকে হাত ছুটে গেল ববের, ডানা আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল, পারল না, পিছলে চলে এল ডগার কাছে। আবার আঘাত হানল বাতাস, আবার ঝাঁকিয়ে দিল বিমানকে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বাতাসে ঝুলে রইল যেন বব, আবছাভাবে দেখছে, তীব্র গতিতে তার দিকে যেন উঠে আসছে ফেনামেশানো পানির ঘূর্ণিপাক, পরক্ষণেই গাঢ় নীল এক নতুন পৃথিবী গিলে নিল তাকে। অজানা এক ভয়াবহ দানব যেন টেনে নামিয়ে নিয়ে চলল, শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়।

গাঢ় নীল রঙ হালকা হতে শুরু করল, তার মাঝে ঝিলমিল করছে শাদা আলোর ফুটকি। বুঝতে পারছে বব, ডুবে মরতে যাচ্ছে সে। বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস, ফেটে যেতে চাইছে। ভেসে উঠুক বা না উঠুক, আর শ্বাস না টেনে পারবে না সে, দম নেয়ার জন্যে হাঁ করল। ঠিক ওই মুহূর্তে নীল রঙ হঠাৎ সরে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল দিনের আলো, বড় বড় টানে বুক ভরে টেনে নিল সে ভেজা বাতাস। কোথায় আছে বোঝার আগে, সাঁতরানোর কথা ভাবার আগেই নিচ থেকে আবার টান মারল তাকে অজানা দানবটা, আবার ডুবে গেল সে গাঢ় নীল জগতে। হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে, কিন্তু কোন লাভ হলো না : শক্তি ফুরিয়ে আসছে। লড়াই করার চেয়ে গা ঢেলে দেয়া অনেক সহজ, অনেক আরামদায়ক বব, মনে হচ্ছে তার কাছে। আবার নিচ থেকে ঠেলতে শুরু করল দানবটা।

আবার বাতাসে ভেসে উঠল ববের মাথা। দম নিল জোরে জোরে। ঘাড় ফিরিয়ে আশেপাশে তাকাল, কঠিন কিছু একটা খুঁজছে, আঁকড়ে ধরার জন্যে। ফেনার মাঝে একটা নারকেলের ডাল চোখে পড়ল। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে এগোতে গেল ওটার দিকে, কিন্তু তিন হাত যেতে না যেতে আবার টান মারল তাকে অদৃশ্য দানবটা। আবার ফিরে এল সেই নীল দুনিয়ায়। বজ্রের গর্জনের মত ভারি একটানা শব্দ কানে বাজছে। অসহ্য হয়ে উঠছে শব্দটা, আর সইতে পারছে না, ঠিক এই সময় হাতে লাগল কঠিন কিছু, খামচে ধরতে গেল, কিন্তু ধরে রাখতে

পারল না। তারপর হঠাৎ করেই দূর হয়ে গেল নীল রঙ, শব্দও চলে গেছে, তীরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে, ঢেউয়ের টানে হড়হড় করে নেমে যাচ্ছে আলগা বালি আর নুড়ি, সেই সঙ্গে সে-ও নামছে পিছলে। থাবা মেরে একটা পাথর ধরে আটকে থাকতে চাইল। হাঁপাচ্ছে। পলকের জন্যে ফিরে তাকাল একবার, আঁতকে উঠল। আরেকটা আসছে! মাথায় শাদাটে সবুজ ফেনার মুকুট পরে ভীমবেগে ধেয়ে আসছে ঢেউয়ের আরেকটা পাহাড়। দুর্বল পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কোনমতে, ইস্, কোনভাবে যদি উঠে যাওয়া যেত আরেকটু ওপরে!

জানে পারবে না, তবুও চেষ্টার ত্রুটি করল না বব। কয়েক হাজার অজগরের মত ফুঁসতে ফুঁসতে আসছে ঢেউটা। 'এল, চলে গেল তার ওপর দিয়ে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বালি আর পাথর খামচে ধরে আটকে থাকতে চাইল সে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। এক ঝটকায় তার হাত ছুটিয়ে নিল দানবটা, টেনে নিয়ে চলল।

আবার নীল জগতে প্রবেশ করল সে। দ্রুত গাঢ় হচ্ছে রঙ, বেগুনী হয়ে গেল দেখতে দেখতে, কালচে, কালো, তার মাঝে নানা রঙের ফুটকি! কানে বাজছে হাজারো ঢাক আর মন্দিরার শব্দ, অসীম অতলে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে অদৃশ্য দানব।

অনেক ওপরের প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে যেন বব, পড়ছে তো পড়ছেই, এই পতনের যেন আর শেষ নেই। অনুভূতিটা খুব খারাপ না, বরং কেমন একটা আরাম! কিন্তু এই নামা শেষ হচ্ছে না কেন? আর পারছে না সে। যা খুশি হয়ে যাক, ঘটে যাক যা ঘটার, আর সে তোয়াক্কা করে না।

নীরবতার জগতে নেমে এল সে, শব্দ নেই এখানে। তলার মাটি রকেট গতিতে উঠে আসছে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেল বব। চোখের সামনে জ্বলে উঠল যেন রক্তলাল আগুন, বোম ফাটল বুঝি!

নয়

বকে ফেনার নিচে হারিয়ে যেতে দেখল ওমর, কিন্তু কোন সাহায্যই করতে পারল না। বিমান সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। ভাবছে, বব তাদের দু'এক মিনিট আগে গেল, এই যা, ওদেরও একই পরিণতি ঘটবে। পানিতে ডুবে মরবে ববেরই মত। ছাই হয়ে গেছে ওমরের চেহারা। কিশোরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'লাফ দাও!' বলেই সামনের পাথুরে চূড়াটাতে নামার জন্যে ডাইভ দিল বিমান নিয়ে।

পৌঁছতে পারল না অল্পের জন্যে। চূড়ার কয়েক গজ আগে পড়ে গেল বিমান। পানিতে, কিন্তু পানিতে পড়ার ধাক্কা যতটা লাগল, ডাঙায় পড়লেও বোধহয় তার চেয়ে বেশি লাগত না। গোড়া থেকে ছিঁড়ে খসে এল ডানা, নাকটা বাঁকাচোরা হয়ে গেল এমনভাবে, যেন জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডিমের খোসা।

কিশোরের আগে লাফ দিল মুসা। পড়ল একটা পাথরের ওপর, কিন্তু থাকতে পারল না, পিচ্ছিল শেওলায় ঢাকা পাথর, পিছলে নেমে এল সে পানিতে, পরক্ষণেই

ঢেউ ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল তাকে আবার পাথরের ওপর।

কিশোর লাফ দিল মুসার পর পরই, পাথরটার কাছাকাছি পড়ল, ঢেউ তাকেও ছুঁড়ে দিল। কিভাবে জানি মুসার একটা বাড়ানো হাত ধরে ফেলল সে, বলতে পারবে না। পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করছে মুসা, অন্য হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল কিশোরের হাত। বড় জোর এক কি দুই সেকেণ্ডেই ঘটে গেল এতগুলো ঘটনা।

ককপিট থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে পৌঁছতে পারল না ওমর, তার আগেই ঢেউ টেনে বিশ গজ দূরে নিয়ে এল বিমানটাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙছে, পানির প্রচণ্ড তা-থৈ নাচের মাঝে পড়ে সাংঘাতিকভাবে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে বিমান, এখন বেরোলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কি করবে? বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। একটানে জামাকাপড় খুলে ফেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চৌকাঠের ওপরের অংশ খামচে ধরল। সুযোগ এলেই, মানে, বিমানটা আবার তীরের কাছাকাছি গেলেই দেবে লাফ।

কিন্তু ওমরের দুর্ভাগ্য, পেল না বিমান। যেন তাকে নিয়ে খেলা করার জন্যেই হঠাৎ থেমে গেল ঝড়, ঢেউ যে একবার এগোচ্ছিল একবার পিছাচ্ছিল, সেটা অনেক কমে এল। বাতাসের গতি এখনও অনেক, কিন্তু ঢেউয়ের উথাল-পাথাল অবস্থা কমে যাচ্ছে, পানি নেমে যাচ্ছে দ্রুত, সেই সঙ্গে টেনে নামিয়ে তীর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে বিমানটাকে, দূর থেকে দূরে। অসহায় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ওমর, কিছুই করার নেই, নেমে যাচ্ছে বিমান হড়হড় করে, গিয়ে পড়বে নেমে আসা পানিকে যেখানে ভীমবেগে আঘাত হানছে ধেয়ে আসা ঢেউ, সেখানে। চোখের পলকে গুঁড়িয়ে যাবে বিমান ওখানে গিয়ে পড়লে।

নিরাপদেই আছে এখন কিশোর আর মুসা, পাথরটার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে ফ্লাইং-বোট আর সেই সঙ্গে ওমরের পরিণতি। ধরেই নিয়েছে ওরা, বাঁচতে পারবে না বিমান, ঢেউ যেভাবে ওটাকে নিয়ে লোফালুফি করছে, আর কয় মিনিট টিকবে কে জানে। ভেতরে নিশ্চয় পানি ঢুকেছে, কারণ ডুবতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। দ্রুত সরে যাচ্ছে দূরে।

পাথরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে অনুসরণ করে চলল দু'জনে, কিন্তু একটা জায়গায় এসে আর দেখা গেল না বিমানটাকে। পাহাড়ের ওপাশে চলে গেছে, চোখের আড়ালে এখন। পাশে সরে, পিছিয়ে, অনেকভাবে দেখার চেষ্টা করল ওরা। চকিতের জন্যে আরেকবার দেখা গেল বিমানটা, একটুখানি সরে এসেই ঝটকা দিয়ে চলে গেল আড়ালে, ওইটুকু সময়ের মাঝেই দেখা গেল ওমরকে, অসহায় ভঙ্গিতে দরজার ধার আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

'কি-কিছু একটা করা দরকার!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। একেবারে খালি গা, কোমরে ইলাস্টিক লাগানো খাটো পাজামা শুধু পড়নে। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুল লেপটে রয়েছে মাথার সঙ্গে, যেন খুলিতে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। কাঁধের কাছে কেটে গেছে, বোধহয় চোখা পাথরে খোঁচা লেগে, পানির সঙ্গে রক্ত মিশে হালকা লাল ধারায় গড়িয়ে নামছে গা বেয়ে।

ডান পা সামান্য বাঁকা করে রেখেছে কিশোর, ব্যথা, কিন্তু মানসিক অবস্থা এমন, কেন ব্যথা করছে দেখার কথাও ভাবছে না। 'টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে স্রোত…,' গলা কাঁপছে তার, 'চলো তো, দেখি, দেখা যায় কিনা…'

'কিভাবে…,' বলল মুসা, 'কোন পথই নেই।…ববেরও যে কি হলো…'

'বোধহয় নেই। কিছুই করতে পারলাম না ওর জন্যে।…এসো, দেখি, ওমর ভাইয়ের কি হলো…'

'কিন্তু কিভাবে…'

'ওগুলো পেরোতে হবে,' আঙুল তুলে ডানে দেখাল কিশোর।

'ওই জঙ্গল?' ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের দিকে। প্রায় খাড়া ঢাল, ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা, মাথা নুইয়ে যেন ঝুলে রয়েছে। 'ধার দিয়ে ঘুরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, জঙ্গলের ভেতর দিয়েও যাওয়া যাবে না।'

'যেতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

কিনার দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ওরা প্রথমে, পারল না। খাড়া পিচ্ছিল পাড়, নিচে পানি। শেষে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়াই স্থির করল। বৃষ্টিতে ভিজে সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি, তার ওপর খাড়া ঢাল। বারবার আছাড় খেল, বেরিয়ে থাকা শেকড়ের চোখা মাথা, কাঁটালতা আর ধারালো নুড়িতে পা কাটল কয়েক জায়গায়, কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, ব্যথা টেরই পেল না। লিয়ানা লতায় বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে পা, বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়ল কিশোর, হাত ধরে তাকে টেনে তুলল মুসা।

বলেছে বটে পারবে না, কিন্তু কিশোরের আগে মুসাই চূড়ায় উঠল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাগর। রক্তশূন্য হয়ে গেল তার মুখ সহসা, হাত তুলে বলে উঠল, 'দেখো দেখো!' কণ্ঠ খসখসে, হাত কাঁপছে থরথর করে।

কিশোরও দেখল। কিছু বলার নেই। কি বলবে? মর্মান্তিক দৃশ্য! প্রায় মাইলখানেক দূরে ঢেউয়ে এখনও দুলছে ফ্লাইংবোটের ধ্বংসাবশেষ, পিঠটা একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। ওমরকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

কয়েক মিনিট নীরবে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, চেয়ে রয়েছে ভাঙা বিমানের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।

নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দিল মুসা। বিড়বিড় করল, 'গেল…,' ধপ করে ওখানেই বসে পড়ে দুহাতে মাথা চেপে ধরল।

আরও দু'তিন মিনিট নীরব রইল দু'জনে। আশা ছাড়তে পারছে না কিশোর, চেয়ে রয়েছে ঢেউয়ের দিকে, শাদা ফেনার দিকে, তীক্ষ্ণ চোখে আতিপাতি করে খুঁজছে ঢেউয়ের প্রতিটি ভাঁজ, ভাঙন, খাঁজ। 'নাহ, দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সে, 'চলো, খুঁজে দেখি ববকে পাওয়া যায় কিনা।'

'কোনদিকে যাব?'

'চলো, এদিকে,' এক দিক দেখিয়ে বলল কিশোর। 'পেছনে গিয়ে আর লাভ কি? ওদিক থেকে তো এলামই।'

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা। পথ নেই, ঘন জঙ্গল, বেশি

অসুবিধে করছে লিয়ানা লতা। খালি জড়িয়ে যায়, গায়ে, পায়ে। ওসব সরিয়ে পথ করে নামতে হচ্ছে, কোনদিকে যাচ্ছে, খেয়াল রাখতে পারছে না, কেয়ারও করছে না বিশেষ, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। একদিকে বেরোলেই হলো। যেদিকেই যাক, আগে-পরে সৈকতে বেরোতে পারবেই।

বালিতে ঢাকা সৈকতে বেরোল ওরা। প্রায় একই সঙ্গে চোখে পড়ল দু'টো জিনিস। একটা সিঁড়ি, হতভাগ্য ফ্লাইং বোটের ছোট্ট সিঁড়ি। বালিতে পানির ধার ঘেঁষে পড়ে আছে। আরেকটা জিনিস পানি আর বালির মিলনস্থলে, ঢেউয়ের ধাক্কায় ধীরে ধীরে দুলছে। দ্রুত এগোল ওরা ওই দ্বিতীয় জিনিসটার দিকে।

'ববের জ্যাকেট,' বলল কিশোর।

বলার দরকার ছিল না, মুসাও চিনতে পেরেছে। পানিতে ভিজে ফুলে রয়েছে পোশাকটা, ঢেউই কোনভাবে এনে ফেলেছে তীরের কাছে। নিচু হয়ে জ্যাকেকটা তুলল মুসা, চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে, এটা নিয়ে কি করবে যেন বুঝতে পারছে না। ফেলে দিতে মন চাইছে না। হাতে ঝুলিয়ে উঠে এল কয়েক পা। হঠাৎ ওটার পকেট থেকে টুপ করে কিছু একটা পড়ল শাদা বালিতে। সোনার মোহর, ডাবলুন।

জিনিসটা কুড়িয়ে নিল মুসা, তালুতে নিয়ে চেয়ে রইল বিমূঢ়ের মত। 'অভিশপ্ত,' ভারি গলায় বলল, 'যেখানে যার হাতে যাচ্ছে, তারই সর্বনাশ করে ছাড়ছে।'

চুপ করে রইল কিশোর।

'এই অভিশাপ আর সঙ্গে নয়,' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে মুসার কণ্ঠ, হাত ঘুরিয়ে সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই থমকে গেল। একটা শব্দ, রাইফেলের গুলির মত।

'আরে!' শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল কিশোর। সৈকতের শেষ মাথা দেখা যাচ্ছে না, আওয়াজটা ওদিক থেকে এসেছে বলেই মনে হলো।

'ওমর ভাই হতে পারে না,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'রাইফেল নেই তার কাছে। বব তো নয়ই। তাহলে? নিশ্চয় জনবসতি আছে দ্বীপে, গ্রাম বা ছোটখাটো শহর আছে···দোকানপাটও নিশ্চয় আছে,' ঝট করে মুসার দিকে ফিরল সে। 'ফেলো না,' হাত নাড়ল, মোহরটা ফেলো না। কাজে লাগবে। বিক্রি করে খাবার কিনতে পারব। কাপড়ও দরকার। চলো, দেখি।'

দ্রুত এগোল ওরা। কিশোরের কষ্ট হচ্ছে, ডান পায়ের গোড়ালি ফুলে উঠেছে, মচকে গেছে বোঝাই যায়। একটা ডাল দিয়ে লাঠির মত বানিয়ে নিয়েছে সে, ওটাতে ভর দিয়ে হাঁটছে খুঁড়িয়ে।

যা ভেবেছিল, তার চেয়ে দূরে সৈকতের শেষ মাথা। দু'মাইল তো হবেই, আধ ঘণ্টা লেগে গেল ওখানে পৌঁছুতে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন।

খুব ধীরে মোড় নিয়েছে এখানে পাহাড়ের ঢাল, গায়ের পাথরের স্তূপ ঢালু দেয়াল তৈরি করে রেখেছে যেন। পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে রয়েছে শুধু পাথর আর পাথর, কোন এক সময় বুঝি এখানে ঢল নেমেছিল পাথরের, নেমে গেছে একেবারে পানিতে। চূড়ার কাছে পাথরের মাঝে যেন হঠাৎ করে গজিয়েছে একগুচ্ছ নারকেল গাছ।

'ওখানে উঠতে পারলে দেখা যাবে কে গুলি করেছে,' হাত তুলে নারকেলের কুঞ্জটা দেখিয়ে বলল কিশোর, 'যদি ও থেকে থাকে এখনও।'

আলগা পাথরও রয়েছে অনেক, নাড়া লাগলেই সড়সড় করে গড়িয়ে নামে, সঙ্গে করে নিয়ে যায় আরও কিছু আলগা সঙ্গী-সাথীকে। পা পিছলে ওগুলোর সঙ্গে পড়লে কোমর ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, নিদেন পক্ষে হাত-পা কিছু না কিছু তো ভাঙবেই।

অনেক কষ্টে অবশেষে নিরাপদেই উঠে এল ওরা চূড়ায়। নারকেলের গুচ্ছের ভেতর ঢুকে ফাঁক দিয়ে তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যেন অকস্মাৎ শেকড় গজিয়ে গেছে ওদের পায়ে।

—o—